চন্দনেশ্বর জংশন

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

তিন সঙ্গী ॥ ৫৭ সি, কলেজ স্ট্রীট ॥ কলকাতা—৭৩

প্রথম প্রকাশ : পয়লা বৈশাখ, ১৩৬৭
এপ্রিল, ১৯৬০

প্রকাশিকা : প্রতিভা চট্টোপাধ্যায়
তিন সঙ্গী
৫৭ সি, কলেজ স্ট্রীট,
কলকাতা-৭৩

মুদ্রক : গোপালচন্দ্র রায়
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন,
কলকাতা—৬

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

তুষার চৌধুরী

স্নেহভাজনেষু

জংশন চন্দনেশ্বরে

মানুষ এক জায়গায় থাকে না। সে অবিরাম তার চলতি অবস্থা থেকে ওপরে উঠতে চায়। কখনো পারে। বেশিরভাগ সময়েই সে পিছলে নিচে পড়ে যায়। শ্রেণীচ্যুত হয়। তাকে আমরা বলি ডিক্লাসড্। তখন আরও এক শ্রেণী নেমে গিয়ে যেটুকুও ছিল—সেটুকুও হারায়। তখন তার সামনে অনিশ্চিত মহাসাগর।

ওপরে ওঠা—উঠতে গিয়ে পিছলে পড়া—পড়ে গিয়ে নিজেকে দেখতে পাওয়া—এইসব নিয়েই চন্দনেশ্বর জংশন। এ নামটা আসলে এই ওঠাপড়ার পৃথিবী ও জীবনের সাইনবোর্ড।

এরকম একটা জীবনে আমি ট্রেন থেকে নেমেছিলাম। আমি আর আমার স্ত্রী। তখন আমাদের হানিমুন করার কথা। বন্ধুরা গালুডি থেকে ফিরেছেন। কবি হলেন। লেখক হলেন। রেসপেকটেবল হয়ে যাচ্ছেন। ওপরে উঠতে চাইছেন। কেউ পিছলে পড়ছেন। কেউ ব্যাংকে জায়গা পেয়ে গেলেন। তবে সবাই উনিশ-বিশ র‍্যাডিকাল, ক্রুদ্ধ, বিয়ে করবেন করবেন —আবার কেউ করে ফেলেছেন। আমার প্রথম দু'খানি উপন্যাস পাণ্ডুলিপি থেকে বই হয়েছে। সেসব বইয়ে শহর, মানুষ, হাসপাতাল, বেকার, প্রেম, প্রেমহীনতা, অবিশ্বাস ও হতাশার অব্যর্থ পরিণাম—ক্রুদ্ধ কাম মোটা দানার চিনি হয়ে দেখা দিয়েছে। এসব কথা বলতে পারছি—কারণ, তারপর তো ১৮/১৯ বছর পেরিয়ে এসেছি।

ট্রেন থেকে নেমে দেখি প্ল্যাটফর্মের বাইরের এক কোটি বছরের পুরনো পৃথিবী ঘট হয়ে বসে আছে। আমায় ডেকে বললো, এখানে থাকো শ্যামলবাবু। ভাড়ায় ছিলাম একজন প্রাক্তন ডাকাতের বাড়িতে কিছুদিন। তখন তিনি ঘোর গৃহস্থ। এঁকে আমার লেখক-বন্ধুরা দেখেছেন। আমার চেয়ে বছর পঁচিশের বড়। তখন অত্যন্ত সজ্জন। ট্রানজিস্টার নিত্যসঙ্গী। বেগুন ক্ষেতে গ্যামাকসিন দেন। বড় ছেলে বিয়েতে পালঙ্ক পেল। মেজো ছেলে বন্দুক দিয়ে ডোখোল পাখি মেরে আমায় খেতে দিলো। ছোট ছেলে দাড়ি রাখছিল। একমাত্র মেয়ে প্রাইভেট টিউটরের সঙ্গে প্রেম করছিল।

ওদের বাবা আমাকে নানা প্রকারের লোভের কথা জানালেন। মাছ, ধান,

জমি। জানালেন—মাঠের ভেতর খুন করলে বডি কিভাবে পিস করতে হয়। শকুন সম্পর্কে সাবধান। ওরাই সেসব টুকরো বয়ে এনে রেলের প্ল্যাটফর্মে ফেলে—আর সোরগোল ওঠে। সেই সময় দেখলাম সুদখোর। বাসন বন্ধকী। জাল বন্ধকী। জমি লিখে দেওয়া। এওয়াজি বদল। ভজিয়ে দেওয়া। ভুজুং মারা। হাল আর সাবেক দাখিলা। ঈশাদী সাক্ষী। ফলের বাগান। ডাঙা জমি। এজমালি পুকুর। ভাগে ভাগে দাহের জন্যে শতাব্দীর চেয়ে বড় বুনো তেঁতুলের বড় বড় ডাল টেকে রাখা।

তখন উনিই বলেছিলেন, খুন করে কক্ষনো সারেণ্ডার করবে না শ্যামলবাবু। উকিলকে টাকা দে পাইলে যাও। সে জামিনের ব্যবস্থা করুক। তারপর হাজির হও। নয়তো পয়লা দফাতেই লকআপে পিটে 'কনফেস' আদায় করে নে সদর আলিপুরি চালান দে দিলি মহা মুশ্কিল। তখন জামিন পেতি মোটা টাকার ধাক্কা।

আমার অবশ্য খুন করার দরকার পড়েনি।

আবার বলা যায়—পড়েও ছিল। আমি একটি খুন করি। শ্যামল গাঙ্গুলীকে। যে কিনা এতদিন সিমেন্টে বসবাসকারী ছিল। তার কিছু গেঁথে যাওয়া ধ্যান ধারণাকেই আসলে আমার খুন করতে হয়।

যেমন, অভাবী মানুষ মাত্রেই সরল ও সৎ—এ কথাটা যে কত মিথ্যে নিজের চোখে দশ বছর ধরে দেখলাম। আবার সারল্য ও সততা—সবই যে চাপের ওপর নির্ভর করে—তাও দেখলাম। তখন রোজ ট্রেনে কলকাতায় আমি যাই। পুলিশ পাহারায় শিল্পীদের মিছিল—পরদিন সকালের কাগজে ছবি। বঙ্গ সংস্কৃতিতে স্টল। হুইসিল দিয়ে ওভারটুনে কবিসভা। ভিয়েতনামে বোমা একটু বেশি পড়লে কিংবা পরমাণু বোমা ফাটালেই আমরা সই দিচ্ছি। দীপেন সই জোগাড় করছে। পরে অবশ্য রাশিয়া আর চীন ফাটাল। তখন ওই বাবদে সই-সাবুদ কমে গেল। বেশ যাচ্ছিল। চমৎকার! দু'জন সম্পাদক দেখা হলে বলেন, শ্যামল—তোমার গরু এবেলা ওবেলা কতটা দুধ দেয়? কিংবা—এবার বিঘে পিছু কতটা ধান পেলে? ধানের মণ কত করে? কেউ জানতে চান না—কি লিখছি। কেউ লেখা চায় না।

আমি হুঁ হাঁ করি। আসলে তখন আমি একখানা পাকা বাঁশের বয়স জেনে ফেলেছি। বর্ষার আগে বড় ডেয়ো পিঁপড়ে কেন বেরিয়ে পড়ে তাও জানি। লতা আদি বুকে হাঁটা প্রাণীর আহারের টাইম নিশুতি রাত। চন্দনেশ্বর জংশনের এই ট্রেনিং ইস্কুলে থাকতে থাকতে পঞ্চানন অপেরা, বন্ধকের কারবারী, নাদু শী, রেস্‌ড়ে অনন্ত বাঁড়ুজ্যের সঙ্গী হয়ে যাচ্ছিলাম। কালচে সবুজ ধানচারায় ঠাসা মাঠের তীরে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার বিন্ বিন্ শব্দ পাই।

চারাগুলো অবিরাম বেড়ে চলেছে। এসব দিয়ে কি সাহিত্য হয়? পৃথিবীর যে কোন দিগন্তই তো একখানা বড় পেন্সিল স্কেচ। রবার ঘষে ঘষে অনর্গল নতুন ছবি হয়ে যাচ্ছে।

এইসব দেখেশুনে আমিও আমার সময়, মানুষ এবং লেখকদের চলতি স্রোত থেকে উথলে বাইরে পড়ে যাচ্ছিলাম। আসলে ওদের থেকে আমি ডিক্লাসড্ হয়ে যাচ্ছিলাম। অথচ এই চলতি স্রোত থেকে আমার তো ছিটকে বেরিয়ে যাবার কোন কথাই নয়। আমার সময়কার মানুষজন—যাঁরা লেখক হচ্ছেন—হয়েছেন—এঁদের আমি জানি। পরিবেশ, পটভূমি, পারিবারিক গঠন যা—তাতে আমারই স্রোতের ভাসা ফেনায় মাখামাখি হয়ে থাকার কথা। আমার অজ্ঞাতে আমি উথলে বাইরে পড়ে গেছি। সেজন্যে দায়ী আমার দেখা-শুনো—আমার জীবনযাপন—সেই যাপন থেকে পাওয়া আলোয় দেখতে শেখা এবং জানা।

এই শ্রেণীচ্যুত হওয়াটা আমার খুবই দরকার ছিল। 'অলীকবাবু'তে একজন লোফার, লায়ার এবং লুম্পেনের কথা বলেছিলাম। ওভারল্যাপিং সীমান্তে সাবধানে দাঁড়িয়ে একজন হয়ে যায় লেখক—অথচ একই ধাচের আরেকজন হয়ে যায় লোফার, লায়ার, লুম্পেন। একজন আরেকজনের পরিপূরক। কিংবা আয়নায় প্রতিচ্ছবির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আসলেব আইডেনটিটি ক্রাইসিস। সেই অলীকবাবুকে একদিন দেখলাম শতকোটির ওপর ব্যবসাদার এক কোম্পানী চেয়ারম্যানের সঙ্গে প্রাইভেট পুলে। তারপরই তাকে দেখি ভূমিহীন এক ফুড-গ্যাদারের সঙ্গে। একদা তাকে দেখেছি ওপেন হার্থ ফারনেসে স্যাম্পেলপাসার হিসেবে। আবার তাকে পাই খবরের কাগজের নিউজরুমে সদ্য প্রয়াত প্রখ্যাতজনের নামের আগে মনীষী কথাটা বসাবে কি না—এই নিয়ে মহাভাবনায় ভাবিত অবস্থায়।

এইতো ফক্কিকারির তুনিয়া। এখানে স্ট্যাটাস, ঠাটবাট, সংবিধান, গণতন্ত্র সবই তো অধিকারী, ভোগী, প্রপার্টিওয়ালার ভোগদখলে বজায় রাখতে আমরা কিছু বি.এ, এম.এ পাশ প্রফেসর, ব্যারিস্টার, ডক্টর, লিটারিয়েটর, এঞ্জিনীয়র কিংবা কমিশনার, ভ্যালুয়ার, অ্যাডমিনসট্রেটার হয়ে বসে আছি। কিংবা পঞ্চায়েত, বিধানসভা সাজিয়ে ওয়েট করছি। সবাই তো আসলে আমরা পাহারাদার। কোমরে গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের বেল্ট। বুকে প্রফেসরের জ্ঞান। মাথায় ব্যারিস্টারের যুক্তি। বচনে এ্যাডমিনস-ট্রেটরের বুদ্ধি। কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে। বিরাট পাহারার কাজে নিযুক্ত। কখনো স্বেচ্ছায়। কখনো অজ্ঞাতে। কখনো ধ্বজাধারীর বিশপ-মার্কা কট্টর গর্বে। আসলে আমরা গবেট বলেই তো। কি করিতেছি জানি না।

এসব কথার কাছাকাছি আমি কিছু লিখতে চাই। তাই চন্দনেশ্বর জংশন। এত বড় পৃথিবীর সবটাই তো সভ্যতা নয়। সবটাই তো শারদ: উপন্যাস নয়। তার বাইরেই তো সূর্যকিরণে জীবন। কয়েক কোটিঃ বছরের। বিশাল পেন্সিল স্কেচ। কল্পনার রবারে মুছে চলেছি। নতুন ছবি হয়ে যাচ্ছে। মনুষ্যত্বের চেয়ে বুদ্ধ, মার্কস এঁরা বয়সে বেশ ছোট। তেমনি জীবনের চেয়েও।

সফিসটিকেশন, সূক্ষ্মতা, বাঁধানো কলতলা, ফাইভ-স্টার হোটেল, বিদেশের রাজধানীতে মন্ত্রীর সঙ্গে ককটেলে, নোবেল লরিয়েটের চালানো গাড়িতে বসে মহানগর দেখতে বেরিয়ে, সেনেটবের সঙ্গে লবিতে দাঁড়িয়ে, অজিতেশের গলায় ক্রেয়নের ডায়ালগে যা বার বাব শুনতে পাই—যে একটি কথা—তা হোল ডিক্লাসড্! ডিক্লাসড্! পড়তে পড়তে নিজেকে দেখতে পাওয়া। সেজন্যে নিজেরও অনেকদিনের অভ্যস্ত ধ্যানধারণাকে নিজের হাতেই খুন করার দরকার পড়ে। এটা যদি 'কনফেস' হয়ে থাকে—তো জানি না—জামিন পাবো কিনা। অবিশ্যি ঘাতক ও নিহত—দু'জনই একজন—সে হোল শ্যামল গাঙ্গুলী। নয়তো বার বার কেন শুনি—আমি নিইচি—তুই দেকেছিস? আমি লোফার। জাত লোফার।

এই পড়তে পড়তে—শুনতে শুনতে জানতে পারাই চন্দনেশ্বর জংশন। এখানে নাদু, শশী, রাধিকে, হৃদয়, সনেকা, বজ্রেশ্বর, অনন্ত, জগা—সবাই পড়ন্ত অবস্থার—উথলে বাইরে পড়ে যাওয়ার মুখে নিজেকে দেখতে পায়। দেখে বিস্ময়, শোক, ক্ষোভ, শান্তিতে আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণের নামও চন্দনেশ্বর জংশন।

এসব কথা সরাসরি বললে পাছে লেকচার লেকচার লাগে তাই আমি একটা এলেবেলে কাহিনী বেছে নিয়ে তাতে মাটি লাগাই। এজন্যে একটা পটভূমি, একটি প্রকৃতির দরকার পড়ে। তাই শুখো পিয়ালীর বুকে রেলপোল কাজে লাগাই। লাগাই পাশেরই বাঁশবন—বাঁশড়ার বিখ্যাত বাঁশবনকে। রেলপোলের নিচে পাথরের বড় বড় চাঁই সত্যিই এক সময় নদীর ঢেউ ভাঙতে নিচে ফেলা হয়েছিল। নদী চলে গেছে। এখন পাথরগুলো পড়ে আছে। এই পড়ে যাওয়া পাথরগুলোও নিজেদের দেখতে পেয়ে স্থির হয়ে আছে। ওরা কতকাল অরিজিন্যাল পাহাড় থেকে উথলে বাইরে পড়ে গেছে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

বেলা আটটার ভরা বাজার। এর ভেতর তিনখানা লোকাল চলে গেছে। নাছু শী তার বন্ধকী কারবারের গদিতে বসে ভোরবেলাকার কাগজখানায় সম্পত্তি, বাড়ি জমি দেখছিলো। নাছুর গদির পরেই চাল পট্টি। তার ঘরের পেছনে অমিয় ডেকরেটিং। হাঁড়ি কলসী মেছলায় পোড়ামাটির কারবার একদম মেছুনীদের জল কাদা অব্দি। ল্যটে, গুলে, শংকর আর কুঁচো চিংড়ির ডাঁই। একদম শেষে খোল কোরানো কাটা কচ্ছপ। খোলশের বাইরে বের করা আস্ত মাংসের দলা কুঁচকে কুঁচকে কাঁপছে। এখানটাই রেলবাজারের তিনটে ঘিয়ে ভাজা কুকুর বাজার ভাঙার অপেক্ষায় বসে। সেই স'বারোটার ছ'নম্বর লোকাল এই চন্দনেশ্বর জংশনের ওপর দিয়ে কলকাতা ছুটে যাবে—তখন বাজার ফাঁকা হবে। ততক্ষণ এই কুকুর তিনজনের জিভ ঝুলে পড়বে। চোখের ঢেলা বেরিয়ে আসবে। ঠিক তখন।

তখন কচ্ছপের কারবারী দেওয়ান ডাক দেবে। এই চুণী। ঘুমিয়ে পড়লি। আই খ্যাখো।

চুণী চারপায়ে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসবে। সঙ্গে সঙ্গে বাকি ছ'জন। মাংসের কারবারীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে তারা মন বোঝার চেষ্টা করবে। শাক সবজি আলু পটলের ব্যাপারীরা ঝাঁকা তুলে খালি গায়ে ক'হাত তাস পিটতে বসেছে।

দেওয়ানের মনটা প্রফুল্ল মনে হলে চুনী লেজ নাড়বে, দেখাদেখি বাকি ছ'জনও নাড়বে।

এই সময় নাছু শী পায়ে পাম্পসু লাগিয়ে তিনচাকায় গিয়ে উঠবে। চন্দনেশ্বরের পিচ রাস্তায় ছ'ধারে পুকুর, গোয়াল ঘর। বাস এলে নাছুর রিকশো থামে। নয়তো সোনার বোতাম আল্লা দিয়ে নাছু শী তার বুকে ফুরফুরে বাতাস মাখবে।

ডানহাতে রেলবাজারের একটা দিক ডাক্তারখানা। বোস ডাক্তার। দুগ্‌গা ফার্মেসী। উপেন গোবদ্দি। হোমোপ্যাথ হরলাল। তেলকল। পুলিশ ফাঁড়ি। বাঁহাতে মনোহারী হোলসেল দোকান। বিড়ি পাতা। সর্ষের খোল। শ্রীকৃষ্ণ স্টোর্স। হার্ডওয়্যার।

এখানটায় বাস এসে দাঁড়ালে রিকশো সাইকেলের জট বেঁধে যায়। কয়লা বোঝাই ঠ্যালা। মিষ্টির দোকানের বারকোশে ভন ভন মাছি। হালফ্যাশানের কাপড়ের দোকানের দোতলায় ব্যাংক। ডাকঘরটা কিছু বেপট জায়গায়। ইলেকট্রিকের বিল জমা দিতে হলে বাসে এখান থেকে পাঁচ মাইল। থানাও তাই। হেলথ্‌ সেণ্টারের বারান্দায় বর্ষার দিনে গরু ওঠে, লাইনের ওপারে। এখনো সেখানে ইলেকট্রিক যায়নি। সামনে তিনটে ইঁট খোলার টিন চিমনি এখানকার সবচেয়ে উঁচু জিনিস। কোন কোন নারকেল গাছও প্রায় অতটা উঁচু। মঙ্গলবার চন্দনেশ্বরের ব্যাপারীদের মালপত্তর গস্ত করতে নাদু শী-র লরি কোলকাতার বড়বাজারে যায়। মণ পিছু চারটাকা থাকে নাদুর। এইসব দোকান পাট রেলবাজার এখন রম রম করছে। শ্রাবনের আজ একুশে। বৃষ্টির নাম গন্ধ নেই। বীজতলায় ধানচারা শুকিয়ে গেল। কবে আর রোয়া হবে। এরপর তো ভাদ্রে আকাশ ভাসাবে।

কাগজ পড়তে পড়তেই নাদু শী দেখতে পাচ্ছিল, চন্দনেশ্বর আর তার গায়ে গতরের বসতি গাঁ গঞ্জ থেকে লোকজন এসে তার গদির সামনে দাঁড়াচ্ছে। হাতে বগি থালা, লোহার কড়ি বসানো জাল, রাম-দা বাঁধা দিতে এসেছে। ভাদ্দরের শেষে দেশ গাঁ ভাসলে জলে ডোবা জমি জায়গা বন্ধক রেখে টাকা নেবে লোকে।

এখানকার মানুষজন, দোকান-পাটের নাড়ী নক্ষত্র নাদুর জানা। দুগ্‌গা ফার্মেসি, তেলকল, বিড়িপাতা—সর্বত্র নাদুর টাকা আছে। টাকায় লেনদেন সারা বছর থাকে। কড়ারে লোন দিয়ে সে আজ

তিরিশ বছর এ তল্লাটে সুদ খায়। এখন এই রেলবাজারেও তার দশ পয়সার শেয়ার আছে।

নাহুর কর্মচারী শশী পাকড়াশি। পেট ভাতায় তার কাছে আছে। নাহুর বাড়িতেই থাকে। বয়স ত্রিশ বত্রিশ। ফাগুন মাসভোর যাত্রার রিহার্সেল দেয়। কিন্তু সে পালায় কোনদিন নামে না। এই এক শখ শশীর। সারা বছর নাহুর বন্ধকী কারবারের সোনা রূপো গালায়। বাসনপত্তর বস্তা বোঝাই দিয়ে বিকেলের ট্রেনে শেয়ালদার বৈঠকখানা বাজারে চলে যায়। সেখানে ঠিক করা দোকানে পালিশ করায়—তারপর নাহু নিজে দেখাশুনা করে সেসব বাসন পার্টি বুঝে ঝাড়ে।

এখন নাহু শী তার গদি মানে বড় জলচৌকির ওপর আসনপিঁড়ি করে থেবড়ে বসে আছে। হাতে খবরের কাগজ। শশী একটা বড় মকরমুখো আঙ্‌টি কষ্টিপাথরে ঘসে ঘসে দাগগুলো পরখ করছিল।

মেঝেটা মাটির। তাতে একখানা বেঞ্চি। পাবলিক এলে বসে।

তাতে এসে একই সঙ্গে দু-জন লোক বসলো। এক জন খালি গা। হাঁটুর ওপর ধুতি। পায়ে পাঁক শুকিয়ে শক্ত। মাথাটি পাখির বাসা। চোখ কটা। লোকটার বয়স তিরিশ হবে।

অন্যজন ঝকঝকে ফরসা। গালে একটা শাদা দাড়ি ডুল ডুল করছে। মাথা ভ্রু—দুইই পাকা। গোঁফ ন্যাতানো আর শাদা। হাফশার্ট আর ধুতি ময়লা। পায়ের রবারের জুতোটিও শাদা। বয়স সত্তরও হতে পারে—নব্বুইও হতে পারে। খোঁজ নিলে হয়তো দেখা যাবে ছাপান্ন।

তাকে দেখে নাহু বলে উঠলো, তা বাঁড়ুজ্যে মশাই—সকাল-বেলায় আর পুরনো কথা পাড়বেন না। তারপর ঘুরে খালি গা লোকটির দিকে তাকিয়ে নাহু শী চোখ মুখ নরম করলো। বল

বাবা। কী করতে পারি তোমার জন্যে? ভালো হয়ে বোসো ব্রজেশ্বর। বাবু হয়ে বোসো।

আমার সময় লাগবে জ্যাঠামশাই। তুমি আগে বাঁড়ুজ্যে মশায়ের সঙ্গে কথা সেরে নাও।

কথা আর কি! সেই টাকা! গহরমেণ্ট তো টাকা নামে কী এক জিনিস বাইরে ছেড়ে বসে আছে। তিরিশ চল্লিশ বছরে কতরকমের টাকা দেখলাম বজ্রেশ্বর।

আমার নাম বজরা।

ওই একই বাবা। যাহা বজ্রেশ্বর—তাহাই বজরা।

না জ্যাঠামশাই। তুমি আগে বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের সঙ্গে সেরে নাও। আমি আবার আলিপুর যাবো।

এখন ক'টা মামলা বজরা?

অনন্ত বাঁড়ুজ্যের একথায় বজ্রেশ্বর নস্কর রীতিমত গর্বের গলায় বললো, তা দাদু বারোখানা মামলা এখন।

সব ক'টি ডাকাতির?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

নাদু শী হেসে বললো, আমাদের বজ্রেশ্বরের সেগুণে কোন ঘাট নাই। চুরি চামারিতে হাত গন্ধ করার পাত্তর নয়।

অনন্ত বাঁড়ুজ্যে নাদুর মুখে হাসি দেখে গায়ে পড়ে ঘনিষ্ঠ হতে চাইলো। বজরা তো আমাদের সেই ফরসা খগেনের পো। তাই না নাদু?

হ্যাঁ। আপনি আবার কথা বলছেন কেন? আমার অনেক কাজের কথা আছে বজরার সঙ্গে।

আজ তো নাদু তিরিশটা টাকা নাহলে আমার সব অচল হয়ে যাবে।

নাদু শী ক্ষেপে উঠলো। পঞ্চান্ন ছাড়িয়েও গায়ের মাংস টাইট। লোকে বলে—শী মশায়ের ভোগের শরীর। যত বয়স বাড়ছে তত

জেল্লা দিচ্ছে। ব্রাহ্মণ হয়ে এই সকাল বেলা মিথ্যে বলছেন কেন?

গরীব হয়ে গেলে লোকে আর ব্রাহ্মণ থাকে না নাড়ু।

কত বড় বংশের ছেলে আপনি। এই স্টেশন করেন আপনার ঠাকুর্দা।

সব জানি নাড়ু। লোক হত না। একলা তিনশো লোকের টিকিট কাটতেন রোজ। এই করে তিন মাসে ট্রেন চালু করিয়ে দেন। সেসব কথা মায়ের মুখে শুনেছি। এ বাজারও আমাদের বসানো। লোক হয় না দেখে ঠাকুর্দা নাকি তিনঘর মেয়েছেলে এনে বসান। তারপরই বাজার জমে ওঠে।

কত বড় জমিদারের নাতি আপনি।

সব মানছিরে সব। তিরিশটে টাকা ঠেকিয়ে দে, যা ইচ্ছে হয় বল—আমি সব শুনবো।

খেলবেন তো রেস।

যদি খেলিই বাবা। মেয়েমানুষের দোষ নেই আমার। মদ ভাঙ খাইনে। তামাক ছুঁয়ে দেখিনি কোনদিন। তা অতবড় জমিদারের নাতি হয়ে একটা শখ থাকবে না?

ঠিক আছে। শশীর কাছে রেখে যাবো। দুপুরবেলা নিয়ে যাবেন। ডেমি কাগজে সই করে যাবেন।

ভোকাটা! সই যত ইচ্ছে বল দিয়ে যাবো। কিন্তু বাঁধা রাখার তো আর কিছু নেই আমার। জোত জমি—বাড়ি ঘর সবই তোমার হাতে নাড়ু।

ওকথা বলেন কেন বাঁড়ুজ্যে মশাই। আমি কি আপনাকে উচ্ছেদ করিচি?

না। তা বলতে পারবো না নাড়ু। আমি এখন তোমার ভাগচাষী।

আরেকখানা ট্রেন এলো কলকাতার। ব্যাংকের বাবু, স্কুলের

বাবু, হাসপাতালের বাবুরা এর পরের ট্রেনে আসে। তখন রিকশো সাইকেলে টান পড়ে।

ভাগের ধানও তো আপনি সব বারে দিতে পারেন না।

তা পারিনে নাড়ু। এটা খুব সত্যি কথা।

তাহলে আপনাকে টাকা দেবো কোন্ সুবাদে?

এবারটা দিয়ে দে বাবা। আমাদের বসানো বাজারে করে খাচ্ছো বাবা। দেখিস আর আসবো না। জমিদারী নেই, পয়সা নেই। গরীব হয়ে তো আর জাতও নেই। এই কটা দিন সাধ আহ্লাদ করে একদম চলে যাবো নাড়ু। দেখিস আর আসবো না।

তবু ঘোড়ার পেছন পেছন ছোটা চাই? দু'টোর গাড়িতে ঝুলতি ঝুলতি ঘোড়ার মাঠে?

আজ খুব ভালো ঘোড়া দৌড়োবে নাড়ু। চাই কি রাজা হয়ে ফিরতে পারি সন্ধ্যেবেলা।

দিয়ে দাওনা জ্যেঠামশায়।

এখনো কোন কাজকারবার হয়নি বজ্রেশ্বর।

ব্রজেশ্বর নস্কর এই মুহূর্তে অন্যরকম লোক হয়ে গেল। তার চোখের সামনে শ্রাবণের চড়া রোদে ভীমের খোদ বড়দা দাঁড়ানো। হাতে পাশার ছক্কা পাঞ্জা। বগলে সুতোর ফ্রেম তোলা পাশার কোট। ফতুর হবার জন্য গলা দিয়ে দাঁড়ানো বাড়ুজ্যেমশাই। নাড়ুর বন্দকী কারোবারের ঠিক নিচেই বাজনদাররা বসে। ধান ওঠার পর অনন্ত বাঁড়ুজ্যে দু'এক পালায় গাইতো আগে। বজরা ছোট থাকতে মায়ের কোলে বসে বাড়ুজ্যে মশাইয়ের গান শুনেছে। দাদুর গিন্নিকেও দেখেছে বজরা। একেবারে টুকটুকে পাকা আমটি।

ক'টাই বা টাকা। দিয়ে দাওনা—

মোহন করে হাসলো নাড়ু শী। ছাখো বাবু। টাকার তুমি কিছু জানো না। আগে সব টাকা শাদা ছিল। দেখা হলি একগাল

হাসতো। টাকাগুলো এখন তো সব কালো। আগের মহারাণীর টাকা তো তুমি দেখনি বাবা।

কী ভ্যাজর ভ্যাজর করতে পারো। বুড়ো মানুষ তো। দ্যাওনা তিরিশটে টাকা। দেখলি কষ্ট হয় আমার—

দিনির কারোবার তো শুরুই হয়নি আমার—

তোমার কাজ তো জ্যাঠা সব্বোনাশ করা। তার আবার শুরু কিসের? দিয়ে দাও দাদুরি—

সই ছাড়াই তিনখানা দশটাকার নোট। বুক পকেটে গুঁজে অনন্ত বাঁড়ুজ্যে ড্যাডাং ড্যাডাং করে রেলবাজারের ভিড়ে মিশে গেল।

অমনি বজ্রেশ্বর নস্কর আর নাদু শী-র গলা খাটো হয়ে এলো। শশী তার বাঁ হাতের ছোট হাপরখানা থামিয়ে কান এদিকে এগিয়ে দিলো। নাদুর চোখে কিছু এড়ায় না। সে চাপা গলায় ধমকালো। নিজির কাজে মন রাখো পাকড়াশি।

আবার হাপর চলতে শুরু করলো। কাঠ কয়লার ফিকি আগুনের উপর একটি নীল শিখা। একখানা মকরমুখো আঙটি। খেয়াদার লোকজন নিয়ে বাস এসে থামলো রেলগেটে। গেট বন্ধ। সোয়া ন'টায় গাড়ি যাবে। কলকাতার ট্রেন এলে তবে ক্রসিং। চন্দনেশ্বর জংশন ছুঁয়ে কলকাতার গাড়ি আরও ঘণ্টা খানেক গিয়ে একটা নদীর সামনে থামবে। তারপর লঞ্চ ঘাটা। শুশুক। সমুদ্রের ঝিনুক বোঝাই নৌকো পাল খাটিয়ে ভরা বাতাসে তমলুক পাড়ি দেয়। চুনের গোলায় সাপ্লাই। সেখান থেকে নদী বন্দরের ভিজে বাতাস, তামাটে গন্ধ এই জংশন চন্দনেশ্বর অবধি হানা দেয়।

বজরায় কি কথায় নাদু বললো, সবদিক সামলাতে পারবি তো?

বজরা কি বললো। তিনচাকার প্যাক প্যাক সে-কথা ঢেকে দিল। তাতে নাদু বললো, ফিরে বল বাবা। কিছু শুনতি পাইনি।

এসব কথা বারবার বলা যায় না জ্যাঠামশাই। তুমি আন্দাজে বুঝে নাও।

বুঝিয়ে বল বাবা। শুনেই মনটা আমার নেচে উঠছে।

আলিপুর যাবো, আর সময় নেই আমার।

নাড়ু দাঁড় করাতে চাইছিল বজ্রেশ্বর নস্করকে। পারলো না। রেলবাজারে তখন মানুষ রাস্তা উথলে বয়ে যাচ্ছে। তার বন্দকী কারোবারের গদির কোণায় থান তিরিশেক জাল ঘরের আড়া থেকে ঝুলে আছে। জংশন চন্দনেশ্বরের নানা লোকের মালপত্র। সব এখানে রাখে নাড়ু। হালকা জিনিস দু'চারখানা বাদে সবই সে হাবিশ করে দেয়। কোথায় করে—কীভাবে করে—কারও জানার উপায় নেই। সে-সব কাজের বেশির ভাগই নাড়ু শী একা একা করে।

নাবাল জমিতে সে যতটুকু পারে রুয়ে দিয়ে বসে আছে। আকাশখানা বেলা দশটার ভেতর তামার টাই। রোদের কোনো মায়াদয়া নেই। বেঁটে খেজুর গাছের পাতায় কালো পিঁপড়ে উঠে পড়ে এখন আর নেমে আসার পথ পায় না। ডগা ঘুচলো। বাতাস উপড়ে ফেলে দেয়।

বজ্রেশ্বর নস্কর রেল গেট পার হয়ে বদ্যিনাথের ধানের গোলায় গেল। এখানে সারা বছর ধান কেনাবেচা হয়। বদ্যিনাথ আজ তিনবছর নেই। বড়ছেলেই কর্তা সাজে রোজ। দাঁড়ি-পাল্লার ফের ভাঙে ব্যবসায়ীদের সামনে। অনেকটা তার বাপের ধারায়। সে হেঁকে উঠলো, কে যায়?

মন দিয়ে কাজ কর। বলতে বলতে বজরা ভেতর দোকানে চলে গেল। সেখানে নোনা জলের প্রাইভেট টিউকল। মাথায় খানিকটা জল চাপড়ে দিয়ে ট্রেন ধরবে বজ্রেশ্বর। ভাত খাবে আলিপুর ডাকঘরের পেছনে।

বদ্যিনাথের বড়ছেলে কৃতার্থ গলায় বলল, একখানা গামছা দেব বজরাদা?

না দরকার নেই। রেজগি হবে তোর কাছে?

কত?

এই শতখানেক টাকার—

নে যাও। বলতে বলতে গেজে থেকে ধানবেচা টাকার ময়লা ময়লা নোট বের করলো বদ্যিনাথের পো। ও টাকা তো তোমারই।

গোনার অপেক্ষা শুধু। বজরা ছোঁ মেরে নিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে দৌড়ালো।

কথাটা মিথ্যে বলেনি বদ্যিনাথের ছেলে। টাকা তো সত্যি তারই। সে-কথাই ভাবছিল বজ্রেশ্বর। চন্দনেশ্বর রেলবাজারের বজরা। সদর আদালতে যার নাম বজ্রেশ্বর নস্কর। সন অফ লেট খগেন নস্কর। গত বর্ষায় কুশবেড়ের তিন গদিদারের গোলায় একরাতে হানা দিয়েছিল বজরা। পুরো দল নিয়ে। পিচরাস্তায় টেম্পো দাঁড় করিয়ে। খোলাখুলি গোলা খালাস করে বজরা সেবারে। মোটমাট সাঁইত্রিশ বস্তা ধান। একটা রাজহাঁস। পাঁচটা গাড়ু আর নগদে রূপোর পৈছেয়, খাড়ুতে সব মিলিয়ে প্রায় সতের হাজার টাকা। গয়নাগাটি জমা দিয়েছিল নাদুর হাতে। সেই রাতেই। আলো ফোটার আগে। পাঁচটি গাড়ু সমেত। রাতে রাতে ধান এসে নামিয়ে দিয়েছিল বদ্যিনাথের গোলায়।

ট্রেন ছুটছে আউলিয়াপুরের বাদার পাশ দিয়ে। এখানে গত বর্ষাতেও থৈ থৈ জল ছিল। ছোটবেলায় বাপের সঙ্গে বজরা এখানে চাষ দিতে আসতো। মই দেবার সময় খগেন নস্কর চেপে বসতো। আর বালক বয়সের বজরা গরুর কাঁধের জোয়াল ধরে ঘোরাতো। ঢেলামাটি গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে ময়দা। তখন ধান না জানি কী সস্তাই ছিল। চালের পালি তো আড়াই টাকা মোটে। মনে পড়ে বজরার। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ ভারি হয়ে আসে। আড়াই টাকার একপালি চালের জন্য? ও আমার বাবা।

বাবাগো। কী রোদের মাঝখানে দাঁড়ায়ে মই দিতিস। বাবা আমার। একটু সুখের মুখ দেখলিনি। আর এখন সে উকিল বাবুদের ফি ধরে দেয়—এক একদিন ষোলটাকা। পেশকার পিওনের পান খাওয়ার পয়সা আলাদা। টাইপের খরচা আলাদা। গাড়ি ভাড়া—খিদে পেলি জলখাবার আলাদা।

খগেন নস্কর আজ বেঁচে থাকলি বজরা কিছুতেই তাকে হালে বলদ-জুতে মাঠে নামতে দিত না। ইলেকট্রিক ট্রেন রেলের পাটি বেয়ে পিছলে পিছলে ছোটে। এক গদিদারের বউ বাধা দিয়েছিল। বজরা তার কানখানা ধরে টান দেয়। কান খুলে কি আসতে চায়? সেই সঙ্গে চেঁচানী। মন শক্ত করে বজরা শেষ টান দেয়। কানের লতি দু'ফাঁক হয়ে গিয়ে গয়নাটুকু চলে আসে বজ্রেশ্বরের হাতে। এইভাবেই তো আসার কথা। কেন যে মেয়েছেলেরা শুধু শুধু বাধা দেয়।

নিশুতি রাতে সে তার নিজের মনের কথাগুলো শুনতে পায়। দুনিয়াটা অন্ধকারে গুঁড়িসুড়ি মেরে পড়ে থাকে। শুকনো বাবলা কাঠের হালকা মুগুর। সঙ্গের লোকজনের হাতে ল্যাজা, কোচ। বজরার কোমরে বস্তার ভেতর পাইপ। এটা একটা সারের বস্তা। লুঙ্গি হাঁটু অব্দি তোলা। খালি গা। মুখে তেলো হাঁড়ির কালি সরষের তেলে মাখামাখি করে মাখানো। পাইপগানের ফাঁকা আওয়াজ যথেষ্ট। তারপর বস্তার ভেতর ভাঁজ করে রেখে দেয় বজরা।

একবার মোটে সে গেরস্থ বাড়িতে আগুন দিয়েছে। সে-বাড়ির লোকজনের ব্যাভার ভাল ছিল না। ঘরের জানালায় নল রেখে গুলি চালাচ্ছিল। গেরস্থর ছোটভাই। সজনেতলা পুকুর—বুকে হেঁটে ঘরের আড়ায় গিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বজ্রেশ্বর। সে আগুনের তাতে দাওয়ায় ফোকরের বাসা থেকে পাতিহাঁস বেরিয়ে পড়ে। এটা তাড়দার ডাকাতির কথা। গতসনের আগের সনে

দুগ্‌গা ভাসানের রাতে। অল্প অল্প হিম ছিল বাতাসে। একটা পাতিহাঁসের লেজের গোছায় আগুন ধরে গেল। সেটা গিয়ে লাফিয়ে শেষে পুকুরের জলে পড়ে। নিশুতি রাতের বুকে আগুন খানা তখন খোদাই করা।

তাড়দা গাঁখানা তখন জেগে গিয়ে দাঁড়ানো। বিদ্যেধরীর শুখো সোতা ধরে বজ্রেশ্বর নস্কর তার সাঙ্গপাঙ্গ সমেত ফিরে আসে। সেই মামলার তদবিরেই তার আজ এই আলিপুর যাওয়া।

সহর কলকাতায় ডাকঘরের পেছনে আদালত। যাকে বলে আলিপুর সদর আদালত। সঙ্গে হোটেল। উকিলবাবু মুশাবিদখানা বজরার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, টাইপে দিয়ে খেয়ে নাও ব্রজ্রেশ্বর। আজ হাকিমের সামনে দাঁড়াতে হবে তোমায়—

কি বলবো ?

সে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে নেব। আগে তো খেয়ে নাও। হাকিমের সামনে জেরায় জেরায় শেষে সত্যি কথা কবুল করে দেবে। যাও খেয়ে নাও।

ডাকঘরের পেছনেই বড় হোটেল। সেখানে একটা মিলের দাম সাড়ে চার টাকা। সে মিলের নাম আবার আসামীভোগ। দু'খানা মাছ দেয়, ডাল ফ্রি। ফাউ ভাতের প্লেট তিরিশ পয়সা। সঙ্গে একটা ঘ্যাঁট।

খেয়ে দেয়ে পান চিবোতে চিবোতে বজ্রেশ্বর নস্কর টাইপ মেশিনের সামনে দাঁড়ায়। ফর ফর করে কাগজ যাতায়াত করে কালো মেসিনের ভেতর। তা থেকে বৃষ্টির ফোঁটায় ফোঁটায় কথা লাফিয়ে পড়ে কাগজে। বজ্রেশ্বর নস্করের অবাক লাগে। তাড়দা কোথায়, কোথায় কুশবেড়ের মাঠে ডাকাতি করলাম। আর সেসব আলিপুরে টাইপ মেসিন বৃষ্টির ফোঁটায় শব্দ তুলে কাগজে কথা ফলায়। যে বাবুটি টাইপ করে তার গলায় পাউডার। হাতে আঙটি, ইত্যাদি। নতুন সাইকেল কোর্টের দেয়ালে ঠেসান দিয়ে

রাখা। সাইকেল, হাতঘড়ি, আঙ্‌টি কেড়ে নিলেই তো তার এই ক'মাসের টাইপের খরচাটা উঠে আসে।

কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই কালো কোট গায়ে আরেকজন উকিল জেরা শুরু করলো বজরাকে।

লাল সালুর ওপরে কোট গায়ে একজন লোক বসে। তার মাথার পেছনে বড় ঘড়ি। বজরা অবাক হবার মত কিছুই দেখতে পেল না।

জেরা করতে করতে উকিলবাবু লেকচার জুড়ে দিল। বজ্রেশ্বর অবাক হয়ে উকিলবাবুকে দেখছিল! অবাক—কারণ এ বাবু তার এত কথা জানলো কি করে? বজরা তার কেটেছে। কবে তার নাম ডাইরি হয়েছে থানায়। সে নাকি দুষ্টু প্রকৃতির লোক। সবই মিলে যাচ্ছে উকিলবাবুর কথায়। কিন্তু এতসব জানলো কি করে বাবুটি। ভেতরে ভেতরে বজরার রক্ত ফুটে উঠছিল।

বজ্রেশ্বর নস্কর একবার চোখ তুলে তার নিজের উকিলের দিকে তাকালো। কোর্ট খুব গরম। বাইরে কালো কালো মাথা। বাইরের বটতলা দেখতে পাচ্ছিল বজরা। ফড়ে, দালাল, মুহুরী, মোক্তার আর আসামীতে গাছতলাটা ছয়লাপ। সে তার উকিলবাবুর দিকে তাকাতেই দু'টি স্থির চোখ দেখতে পেল। বুঝতে পারলো না কি করবে। তাই আন্দাজে চুপ করে থাকলো।

জেরার বদলে আরেক উকিলবাবু তখন বজরার নামে গল গল করে বিষ নামাচ্ছিল।

মাই লর্ড। আসামী বজ্রেশ্বর নস্কর সন্দেহজনক প্রকৃতির লোক। ইতিপূর্বে সে কাছারি বাজারের কুপল্লীতে নেশা করে মারপিটের দায়ে দু'বার গ্রেফতার হয়। তার নামে ছোটখাটো অপরাধের তালিকা তো দীর্ঘ।

বজরার উকিল আপত্তি করে উঠলো। মাই লর্ড। এসব কথা আসামী বজ্রেশ্বর নস্করের বিরুদ্ধে চলতি মামলার এক্তিয়াতে পড়ে

না। সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। আমি আপত্তি জানাচ্ছি। আই প্রোটেস্ট।

অপ্রাসঙ্গিক কথাটা বজরার খুব জোরালো লাগলো। ছররা গুলির কায়দায় কথাটির খানিকটা টুকরো তার কানে এসে বিঁধলো।

এভাবে আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে মন বিষিয়ে দিতে দেওয়া যায় না ধর্মাবতার—

অন্য উকিল তখন বলছিল, শুধু তাই নয়—আসামী বজ্রেশ্বর এর আগে তিনবার রেল পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। অপরাধ গুরুতর। ইলেকট্রিক ট্রেনের তার কাটা। কিন্তু প্রতিবারই আসামী সন্দেহের অবকাশে আইনের বজ্রমুষ্ঠির ভেতর দিয়ে গলে গিয়েছে। কিন্তু এবার এই তাড়দার ঘটনার, ধর্মাবতার, যদি সব কাগজপত্র দেখে থাকেন তো বুঝবেন—আসামী বজ্রেশ্বর নস্কর ঠাণ্ডা মাথায় যে কোন অপরাধ করতে পারে। সরকারের অভিযোগ—অগ্নি সংযোগ। মারধোর। জোর করে গয়না গাটি কেড়ে নেওয়া। এবং বেআইনীভাবে সংগ্রহ করা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার। এবার আসামীকে আইনের শাসন মাথা পেতে নিতেই হবে মাই লর্ড।

কথাগুলো একটিও মিথ্যা নয়। বজরা ভাবছিল—এতসব জানলো কি করে লোকটা। নিশ্চয় চন্দনেশ্বরের কেউ লাগানী-ভাগানী করেছে। তার বিরুদ্ধে। নয়তো—কেউ ফাঁস না করলে তো এতকথা জানার কথা নয় উকিল বাবুর।

মাই লর্ড : আসামী কাছারিবাজারের কুপল্লীতে—

বজরা ভেতরে ভেতরে অনেকক্ষণ ধরেই ফুটছিল। প্রায় বাঘের গলায় সে ধমকে উঠলো। গিয়ে থাকি তো সেখানে নিজের পয়সায় গিইছি, তাতে কার কি ?

ধর্মবতার নামে অল্পবয়সী লোকটি লাল সালুর ওপরে টেবিলে শব্দ করে বলে উঠলো—অর্ডার। অর্ডার।

তা ধর্মাবতারকে কচিই লাগলো বজরার। কতই বা বয়স হবে।

তার চেয়ে তো ছোট নিশ্চয়। কোনোদিন তো বাপের সঙ্গে হাল দিতি যেতি হয়নি ধর্মবতারের। বজরা শুনেচে—এদের ঘরবাড়ি ছবির মত হয়। এরা মাইনে পায় মাসকাবারে। অনেক টাকা কড়কড়ে নোট। একবার এক মান্যগণ্য কচি মানুষের টাকা পয়সা সে একা পেয়ে কেড়ে নিয়েছিল। হাতঘড়ি কলম সমেত।

বজরার উকিল দাঁড়িয়ে উঠলো। আই প্রোটেস্ট।

শেষের এই কথাটাও জোরালো। পটাং করে গিয়ে কানে লাগলো বজরার। এই কোর্ট কাছারি তার আর বিশ্বাস হয় না। একখানি লাল কাপড়ের ওপাশে বসে কচিমত লোকটি কি করে মাঠ-ঘাট দুনিয়া তার তাঁবে রাখে। কিসির ভয় দিয়ে? সন্ধ্যো রাতে ডাকাতি করে বজ্রেশ্বর নস্কর তিরিশ মাইল পথ হেঁটে এসে বিছানায় ঘুমিয়ে থাকতে পারে শেষ রাতে। তার মত লোককে এই আদালত ঘরখানা কি করে ধরে রাখবে। বুঝে উঠতে পারে না বজরা।

তখনো উকিলবাবু কি সব উগরে যাচ্ছিল। একটা কথাও বজ্রেশ্বর শুনতে পাচ্ছিল না। সে আন্দাজে বাবুটির ঠোঁট নাড়া দেখছিল। ঠিক এই মুহূর্তে এসবের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। সে অল্প বয়সে বড় দিঘিতে ডুব দিয়ে ভাট ফুলের বুকখানা তুলে চিরে ফেলতো। নাল মাখানো পোস্তর দানা, বিচি বুড়ো আঙ্গুল ডুবিয়ে তুলে তুলে খেয়েছে বজরা। এইভাবে খিদে মিটিয়েছে। তাই সে জুতো পায়ে দেওয়া ভদ্দরলোকদের কোনদিনই পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। সে জানে—ওরা পৃথিবীর একপাশে থাকে। বেড়া দিয়ে অল্প একটু জায়গায় থানা, আদালত, রেলগাড়ি চালায়। দুনিয়ার বাকিটুকু তো বজরার জন্য পড়ে আছে। ছুটে বেড়াও, হাল দাও, নয়তো আগুন লাগাও।

এই আগুন কথাটা করকর করে তার মন থেকে মাথার ভেতর চলে গেল। গিয়ে সেখানে একটু একটু করে ধরে উঠতে লাগল।

তাড়দার সেই গেরস্থরাও আদালতে হাজির। কোর্টের সময়টা আগাগোড়া তারা বজরার দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকে। তাদের উকিলের আবেদন, জামিন করে দিয়ে বজরাকে হাজতে পোরা হোক।

কিন্তু সে আবেদনের আগেই বজ্রেশ্বর নস্কর জামিনে খালাস পেয়ে বসে আছে। ধন্য উকিলবাবু। ধন্য! এই ভাবেই ভাবে বজরা। তার চোখ দু'টো কটা। কিন্তু ভেতরে ভেতরে গরম হয়ে গিয়ে বজরা তার ঠোঁটজোড়া ছুঁচলো করে ফেলে।

শ্রাবণ মাসটাও চলে আসে। তবু বৃষ্টির দেখা নেই। দিনে একটু বাতাস নেই। রাতে যেটুকু ঠাণ্ডা—তা ঘুমোলে ফুরিয়ে যায়। ইদানী রাতে রাতে বজরার কাজ বাড়ছে। চন্দনেশ্বর জংশনে মালগাড়ি দাঁড়ানোর অনেক গুলো লাইন আছে। তার দু'একটা লাইন এখন বাতিল। ঘাসে ঢাকা পড়ে আছে। সেখানে কোদাল কুপিয়ে মেটো ঘাস সাফ করা দরকার পয়লা দফায়। তারপর এক একখানা শ্লিপার তুলতে পারলে—কাঠ হিসেবে চেরাই কলে পৌঁছে দিলেই নগদ।

তাছাড়া বাঁশড়ার জঙ্গলের ধার দিয়ে যেখানটায় রেল লাইন বেঁকে গেছে—ওখানে আর পি এফের পৌঁছানো কষ্টকর। ওখানটাতেই ইলেকট্রিকের তার কাটা সবচেয়ে নিরাপদ। কাটলে বছরে একবার ওখানে কাটাই ভাল। ইলেকট্রিক ট্রেনের তার তো তার নয়—আসলে সোনা। আদালতে দাঁড়িয়েও পরিষ্কার লাইনটা দেখতে পাচ্ছে বজরা। নীচে একসময় নদী ছিল বলে ব্রীজের ওপর দিয়ে লাইন চলে গেছে। এখন নদী নেই, সেখানে বাঁশবন, তাই চলতি কথায় বাঁশড়া। কেউ বলে বাঁশড়ার জঙ্গল। আর পি এফের সেপাইরা ওখানটায় বুট পায়ে দৌড়ালে নির্ঘাৎ পা হড়কাবে। রেললাইনের নীচে জীপগাড়িও পৌঁছবে না। একসময় নাকি ওখানটায় নদীটা ক্ষ্যাপামত ছিল। এক ঘটনায় তাই রেল

কোম্পানী ব্রিজ বাঁচাতে পাথর ফেলে ঢেউয়ের কোমর ভেঙে দেয়। জল চ'লে যাওয়ার পর সেসব পাথর এখনও ওখানে পড়ে। সে পাথর টপকে কোন দিন গাড়ির আসার সাধ্যি নেই।

বজ্রেশ্বর নস্কর এই সব পাথরের এক একটা নাম দিয়েছে। সেই ছেলেবেলা থেকে সে পাথরগুলোকে চেনে। তাদের মাথায় বেড়ালের থাবা করে পা ফেলে ফেলে সে ব্রিজে উঠতে পারে। চলন্ত ট্রেন যাবার সময় আবার নিচের স্লিপারে বজরা দু'হাত আঙটা করে নেমে যেতে পারে। এখানে তার কাটলে কে তাকে ধরে!

তাড়দা মামলার রাজসাক্ষী বজরার চোখে চোখ তুলে তাকালো। পালান মিস্ত্রি, বাঁ চোখের নিচে বড় করে কাটা দাগ। দু'পাশে দু'জন সেপাই। হাজতে ধোলাই খেয়ে সাক্ষী সেজেছে। বজরার চোখে লাল করে তাকালো পালান। বজরা কিছু বললো না। তার উকিল বলেছে, মামলাটা দায়রায় উঠলে পালান যদি একবার বলে, হুজুর—মারের চোটে আমি ওসব কথা বলেছি—তাহলে তোর মামলা বিলকুল ফেঁসে যাবে। পালানকে দিয়ে একথা বলাতে পারবি?

খুব পারবো।

কি করে পারবে? ওর সঙ্গে তো তোমার দেখা হচ্ছে না।

তাতে কি। ওর বাড়ি গে আজই রাতে চড়াও হবো। মা বউকে এমন ঠ্যাঙাবো—তারাই এসে পালানকে দিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলাবে।

দেখো বাবা শেষে না সব বিগড়ে যায়।

শ্রাবণে আকাশ ভারি হয়ে আসে বিকেলে। কিন্তু বৃষ্টির ছিঁটেফোঁটা নেই। আদিগঙ্গার ওপর নতুন পোলে দাঁড়িয়ে বজ্রেশ্বর নস্কর একবার জেলখানার দেওয়ালটা দেখে হাসলো। তারপর নবগ্রহ মন্দিরের দিকে তাকিয়ে এক হাত তোলা ভগবানকে নমস্কার

করলো। ভগবানটির নাম তার কোন সময়েই মনে থাকতো না। এ এক মুস্কিল।

ব্রিজ ধরে এক জুতোর দোকানের পায়ের কাছে বজরা থেবড়ে বসলো। তারের জালের ভেতর মুনিয়া ছটফটাচ্ছে, টিকিধারী গণৎকার পুঁথি পেতে আসন করে বসে। বজরা এসবে বিশ্বাস করে না। গণৎকার আলিপুর-ফেরৎ লোক দেখলে একরকম বলে। আলিপুর-মুখো লোক দেখলে আরেকরকম। বজরা জানতে চাইলো, বড় মুশকিল যাচ্ছে—

মামলা কিসের?

ডাকাতির—

ডাকাতির? ওরে বাপস্। কে করলো? জানাশোনা লোক?

হ্যাঁ।

কে হয় তোমার? তাকে নিয়ে এসো। হাত গুণে বলে দেবো।

আনতে হবে না। আমি নিজিই ডাকাতি করিছি। বারো বারোটা মামলা—

গণৎকার একটু পা গুটিয়ে বসলো। সামনে দিয়ে ট্রাম বাস যাচ্ছে। চোখের সামনে ট্রাফিক পুলিশ। বুকে অনেক সাহস এনে বললো, তা ঘুরে বেড়াচ্ছো যে বড়!

জামিনে খালাস আছি দাদা। আর কতকাল যে মামলা চালাতে পারবো জানি না। পান খাওয়ার পয়সা দিতি দিতি বাজারে মোটা পয়সা দেনা হয়ে গেল।

কি রাশি তোমার?

সে তো জানিনে—

কি বার জন্ম?

তাও জানিনে। আমাদের ঘরে তো ওসব লেখাজোকার পাট নাই।

মায়ের মুখে শোননি কোনদিন?

আমাদের এই সাধারণী মা। ওসব মনে রাখতি পারে না দাদা।

ও!

এভাবেই আরও কথা এগোতো। নবগ্রহ মন্দিরের পাশেই শ্যাওলা-ধরা দেওয়ালের একটা কানকাটা বাড়ি দাঁড়ানো। তার কোনো জানালাতেই রোদ বৃষ্টি আটকানোর দরজা নেই। একদম খটখটে দিনের আলোয় তেলেভাজা-দোকানী হ্যাজাক ধরিয়ে টাঙিয়ে দিল আড়ায়। হিংয়ের গন্ধ। গণৎকারের কাছে হাত এগিয়ে দিয়েছিল বজরা। গন্ধটা তার চেনা। দিনের বেলায় তেলেভাজার দোকানে আলো কখন জ্বলে তাও জানে বজরা। এ যে কাছারি-বাজারের চেনা ছবি।

বজ্রেশ্বর নস্কর চোখ ফিরিয়ে তাকালো। মন্দিরের গা দিয়ে একটা ঢালু পথ আদি গঙ্গায় চলে গেছে। পথের গায়ে উঁচু পোল। তাই রাস্তা থেকে গঙ্গা চোখে পড়ে না। গুটি পাঁচ ছয় মেয়েমানুষ। ঢালু পথের গায়ে কানকাটা বাড়িটার সদরে দাঁড়িয়ে।

একটু আসছি দাদা। এই এলুম বলে—

তোমার তো বেমারি দশা।

এসে দেখচি দাদা। বলেই বজ্রেশ্বর নস্কর সেই সদর দরজায় দিয়ে দাঁড়ালো।

গণৎকার মুখ ফিরিয়ে নিল। তার এ ফুটপাত থেকে আদিগঙ্গার ওপরে মোষের বাঁধানো খাটাল কাঠগোলা অব্দি দেখা যায়।

এই সময়টায় কালো কোট গায়, হাতে নথি কিছু উকিল আদালত থেকে ফিরছিল। দোতলার ঘুপচি মত জানলা দিয়ে বজরা রাস্তায় চলন্ত তার উকিলকে দেখতে পেল। হাতে জালের ঝোলায় গুটি কয় ল্যাংড়া।

এই তোমার নাম কি গো?

বজরা তার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে দিয়ে বললো, নাম দিয়ে কি করবে?

আমি পাপিয়া—। ভাল পাকি জিনিস আছে। খাবে?

কালিঘাটের পাকি মাল তো। বড্ড মিঠে। খেলি গা গুলোয়।

দুই

হাজার হাজার বছর এই চন্দনেশ্বরে মানুষ জন্মাচ্ছে। সবাই একসঙ্গে মরে না। সবাই একসঙ্গে জন্মায় না। তাই সুখ দুঃখ নানা রকমের। এক এক পুরুষে এক এক বংশের ভিটে বদলে যায়। একফালি পুকুরও হাতবদল হয়। আগেকার কালের সুখের জায়গায় নতুন সুখ আসে। দুঃখ, রাগ, ভালবাসা মাটি চাপা গাছের ধারায় মানুষের আয়ুর সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে শরীর রাখে। জংশন চন্দনেশ্বরে ততক্ষণে আরেকদল মানুষ বড় হয়ে ওঠে। তাদের রাগ ভালবাসা তখন কিছুকালের জন্য বড় হয়ে ওঠে। সেসব সুখ দুঃখও আবার একদিন মাটিতে মেশে।

জংশনে কয়লার ইঞ্জিনের আমলের জলের ট্যাঙ্কে এখন প্রায়ই শঙ্খচিল নেমে এসে বসে। কারণ, নিচে রেল লাইন ঘেঁষে তখন মাছের নীলামবাজার। কলকাতার ব্যাপারীরা খদ্দের। এই বাজারের ভেতর দুই সঙ্গী নিয়ে চুনী ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আসলে বাজারের চেয়ে নীলামদারদের ওপর তার বেশি নজর। ওরা চায়ে ভিজিয়ে বিস্কুট খায়। খাবার সময় চুনী আর তার সঙ্গী সাথী চোখ খোলা করে মানুষটার মুখে এমন করে তাকাবে—অমনি বিস্কুট ভেঙে খানিকটা সে চুনীর জন্যে ছড়িয়ে দেয়।

নান্টু শী এক একদিন বলেই ফেলে—অমন ফিলিংস দিয়ে দাঁড়াস নে চুনী। আজ কিছু দিতে পারবো না। তুই শশীর দলে প্লে করগে যা।

যত বয়স বাড়ছে—চুনীর ঘুম কমে আসছে। সে রাত থাকতে উঠে বসে। জংশন প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করে। তখন ফার্স্ট লোকালে আনাজ আর মাছ ব্যাপারীদের ভিড়। তারা যা পারে

দেয় চুনীকে। অফিস-বাবুরা ট্রেন ধরতে এলে চুনী গিয়ে ওভার-ব্রীজে ওঠে। এখান থেকে রেলকামরার মাথা, রেলবাজারের কোথায় কোথায় খাবার পাবে—তা এক পলকে দেখতে পায় চুনী। তারপরই সে রেলবাজারে নেমে আসে। সেই দেড়টা দু'টো অব্দি রেলবাজারে চুনীর অফিস।

বেলা আড়াইটে নাগাদ খা খা বাজারের টিনের চালার নিচে দেওয়ান ডাক দেয়। আ—আ—আ—কোথায় গেলি তোরা—সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ও চুনী—

চুনী তার দলবল নিয়ে ছুটে আসবে। গরম গরম মোটা চালের ভাতে হলুদ আর কচ্ছপের নাড়িভুড়ি মেশানো একরকমের বিরিয়ানি। শশী পাকড়াশি এই সময়টায় নাচু শী-র ফাঁকা দোকান আগলায়। সেখান থেকে সে চেঁচাবে। অ দেওয়ানদা—আমার জন্যে একটু কুকুর বিরিয়ানি রেখো গো। বড় সুন্দর গন্ধ দিচ্ছে—

কেউ কেউ এবাজারে দেওয়ানকে আদর করে কুকুরদের মিনিষ্টার বলেও ডাকে। দেওয়ান অবাক হয়ে তাকায়। সে আবার মিনিষ্টার হোল কি করে! এলাহাবাদের চালানী কচ্ছপ কিনে আনে কলকাতা থেকে। মাংস বিক্রির পর কোরানো পিঠগুলো রেলবাজারের আদাড়ে ছুঁড়ে দেয় দেওয়ান। আদাড়ে সেই কোরানো পাহাড়ের ওপর কাক হেঁটে বেড়ায়। আসলে কাকগুলো ওখানে মাংসের লোভে কুচকাওয়াজ করে।

খাওয়া হয়ে গেলে চুনী মুখ তুলে তাকায়। দেওয়ান বলে, এত যে খাওয়াই—গায়ে লাগে কোথায়? চেহারাটা ভালো কর।

চুনী লেজ নাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে জংশন চন্দনেশ্বরের মাথার ওপরকার আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলো। রেলপুকুর, কচুবন, ইঁটখোলার চিমনি—সব ভিজে যেতে লাগলো। থালা উপুড় করা মেঘ জংশন-প্ল্যাটফর্মের অ্যাসবেসটস ছাউনির ওপর ঝুলে পড়লো। রেল লাইনের গায়েই দাঁড়ানো গরু ভিজছিল। পোকা-পতঙ্গ ঘাসে

কাকের ঠোকরানির চেয়ে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ায় আরাম বেশি। কোনো কোনো গরু আরামে চোখ বুজে ফেললো।

জংশন ফেলে—পিচরাস্তা ফেলে—তবে কাঁচা রাস্তার গায়ে নাড়ু শী-র বাড়ি। বাড়ির উঠোনটা বাঁধানো। বাঁধানো পুকুর ঘাটলা। চন্দনেশ্বরে সে এসেছিল বালক বয়সে। এটা তার দেশ নয়। এখন কিন্তু দেশ হয়ে গেছে। রাখাল গাজির মুদিখানায় একপো দেড়পোর মাল ঠোঙা বোঝাই করে বাণ্ডিল বেঁধে রাখতে হোত। সোডা, মুশুর ডাল, সঠি—এইসব আরকি। পাকা তিনটি বছর একাজের পর সে একটা আন্দাজ পায় রেল বাজারের। তখন তার বয়স চোদ্দ। যুদ্ধ লাগল। কাঁচা পয়সার ছড়াছড়ি। শুধু লুফে নিতে জানা চাই।

সেই বয়সে নাড়ু ভাঙা লোহালক্কড় কিনতে শুরু করে। দুর্ভিক্ষটা এসে পড়ায় মরা হাজা মানুষজনের জায়গাজমিও অল্প টাকায় রাখতে থাকে। অনেকে পটল তোলায় যুদ্ধের পর সবে গোঁফ ওঠা নাড়ু শী দেখলো, তার বিষয় সম্পত্তি তো কম নয়। রেলবাজারের কারোবারী লোকজন তাকে নাড়ুদা নয়তো শী-মশায় বলে ডাকতে শুরু করেছে। শুধু মুদীখানার রাখাল গাজি আজও তাকে নাড়ু বলেই ডাকে। নাড়ুও তাকে বলে গাজী সাহেব।

বৃষ্টি মাথায় করে নাড়ু বাড়ি ফিরলো আজ। আর ক'টা দিন পরেই ভাদ্র। এখনো তার প্রায় সব জমিই রোয়া বাকি। এদিককার ঘাস লতাপাতা—সবই বেয়াড়া রকমের বাড়ে। লাল রং মেশানো সিমেণ্টের মেঝে। তাতে মাদুর পেতে বসে নাড়ু তার বউকে ডাকলো। নাড়ু যেমন টাইট শরীরের—বউটি তার তেমন নয়। গত আষাঢ়ে একমাত্র মেয়ে রাধিকার বিয়ে দিয়েছে। সেই থেকে মেয়ের কথা ভেবে প্রায়ই বউ কাঁদতে বসে। ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েও এই ছিঁচকান্না নাড়ুর একদম অপছন্দ।

বউ তবু বলে, অত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিলে কেন? আমাদের কি কোন অভাব ছিল?

বিয়ে তো দিতেই হোত একদিন। বাড়ন্ত মেয়ে। পরের ঘরে যখন যাবেই একদিন—তখন নাহয় কিছু আগেই গেল।

উহু। তোমায় আমি জানিনে! বে দিয়েছো খরচ বাঁচাতে।

খরচা করে লোক খাইয়ে টাকার বাণ্ডিল পুড়িয়েই তো বে দিলাম। এ তুমি কি একখানা কথা বললে গিন্নি!

তোমার হিসেবের খাতা আমি দেখিছি। কুমারী মেয়ের খাই-খরচ, জামা কাপড়, পড়াশুনো বাবদে বছরে কত খরচ—তাও যেমন খাতায় একদিকে লিখেছো—আবার বিয়ের বাবদে কত খরচ তাও তো লিখে রেখেছো। তারপর লিখেছো—আটটি বছর মেয়েকে ঘরে রাখলে যা খরচ—একবারে কিছু খরচা করে বে দিয়ে দিলি সে-খরচার শেষ।

ও আমার এমনি একটা অঙ্ক। ও অঙ্ক আবার দেখতি গেলে কেন গিন্নি? স্বামীর সব জিনিস দেখতি নেই। কিছু অজানা থাকা ভাল।

নাহুর আজকের ডাকে তার বউ সাড়া দিল না। বড় ছেলের নাম ধরে ডাকলো। কোন সাড়া নেই। ছেলের নাম জগন্নাথ। সে কলকাতায় এফিডেবিট করে জগন্নাথ সরকার হয়েছে। বাড়িতে টিকিটি দেখার যো নেই। পাখা ঘোরানোর কারেন্ট নেই। আসবে হয়তো সেই সন্ধ্যেবেলা। ও জগা—বলে একবার ডাক দিল নাহু শী। কোন সাড়া নেই। গাই-বাছুর, ঘরবাড়ি দেখাশুনোর সবসময়কার লোকটির নাম ধরে ডেকেও কাউকে পেলনা নাহু। ইচ্ছে ছিল, গিন্নি এসে হাতপাখার ডাঁটি দিয়ে তার পিঠের ঘামাচি-গুলো মারুক।

আমি কি তবে ফাঁকাবাড়িতে একা? সদর খোলা। এভাবেই বাড়ি পড়ে থাকে? খাট পালঙ্কের নীচে বন্দকী কারবারের হাঁড়ি কলসী সারি সারি উপুড় করে সাজানো। দেশ গাঁয়ের মানুষজন তো তাকে চিরকালই হিংসে করে। এ অবস্থায় গিন্নি বাড়ি ছেড়ে যায়

কি করে? তার তো কিছু অজানা নয়। তারই তো চোখের সামনে নাহুর অবস্থা ফিরেছে। একটু একটু করে কারোবার ফেঁপে ফুলে উঠেছে।

মনে ফুর্তি থাকলে নাহু তার বড়ছেলেকে সরকার-বাবু বলে ডাকে। মেয়ে বে হয়ে চলে যাবার পর সরকার মশাই-ই এখন তার মায়ের প্রধান সঙ্গী। কারণটি নাহুর অজানা নয়। জগা যে ভাবে পারে বাপের পকেট—মায়ের আঁচল হাতাচ্ছে। নাহু সবই বোঝে। কিন্তু কোন বাধা দেয় না। আসলে ছেলের ব্যবসায় মাত হয়েছে। কোত্থেকে এক ভাঙা বাস কিনে সারাচ্ছে। লোকজন নিয়ে বেড়াবার লাইন খুলবে। আজ দীঘা। কাল বক্রেশ্বর। মায়ে পোয়ে এসব আলোচনা যখন করে—তার ছিঁটেফোটা নাহুর কানে ঢুকেছে। নাহু তো এই চায়। একটু একটু করে জগা সরকার টুরিস্ট সারভিস গড়ে তুলুক। তাহলে কারবারে মায়া বসবে। নয়তো নাহু তো এখুনি জগন্নাথকে নয়া বাস বের করে দিতে পারে। তাতে বরং জগা নিজির পায়ে দাঁড়াতে পারবে না।

মায়ের পোয়ের আলোচনাটি কানে গেছে নাহুর। ও সব্বনেশে কারোবারে তুই যাসনে! দেশসুদ্ধু লোকের শাপমন্যি জুটবে সারাদিন! একটা মাকড়িরে, একটা জালরে. দু'টো গাড়ুরে —সারাজীবন এসব গোনাগাঁথা করে গচ্ছিত রেখে ছিল বলে?

নাহু শোনে আর একা একা এই সামনের দিককার ঢাকা বারান্দার লাল মেঝেতে বসে বউ আর ছেলেকে নিঃশব্দে ভ্যাঙায়। মুখের ভাবটা—আমি নাহলি—এই কারোবারো না থাকলি—মায়ে পোয়ে মিলে আড্ডা মারা চলতো? বাস কেনার জন্যি তুমি আমার টাকা হাতিয়ে জগাকে তিরিশ হাজার টাকা দাওনি? আমি সব জেনেশুনে চুপ করে থাকি। বুঝেছো।

তার মনের কথাগুলো কিছুতেই মুখে থাকে না। মাথার ভেতরে পাক খায়। কথাগুলো অনেকটা এরকম—

কারোবারে ঝক্কিতো থাকবেই। মানুষ সকল হুলি লোকের গা টাটায়। তা বলে পিছোতে হবে? একটা মাকড়ি—দু'টো গাড়ু—এই করে করেই তো সংসার ঠেলে তুলিছি। তখন তোমরা ছিলে কোথায়! দিব্যি সেই পয়সায় খেয়ে দেয়ে হাসি ঠাট্টা ঘুম—সবকিছু চালিয়ে গ্যাছো। কিছু তো থেমে থাকেনি।

বাড়িখানা নাড়ুর খুব ছোট নয়। একতলায় তিনখানা। দোতলায় দুখানা ঘর। খোলা ছাদে জামাই মেয়ে এসে শীতে রোদ পুইয়ে গ্যাছে। অন্য সময় বড়ি শুকোতে দেয় তার গিন্নি। উঠোনের বাঁধানো চাতালের ওপারে খানিকটা উঠোন এখনো মাটির। সেখানে একটি লাউমাচা। তার পেছনেই গোহাল। এখনও ফাঁকা। রোয়া শুরু না হলেও গাই বাছুরকে পাহারায় পাহারায় ঘাস খাওয়াতে হচ্ছে। কেননা, সব মাঠেই তো এখনো খানিক খানিক জায়গায় বীজতলা।

বাড়ির সামনেই ঘাট-বাঁধানো পুকুর। সতেরোশো টাকায় কিনেছিল নাড়ু। তখন আশেপাশে মাঠ। নাড়ু এসে বাড়ি করায়—সংসার করায়—ইলেকট্রিক আনায়—লোকের এদিকে ঝোঁক হয়। তবে না লোক বসতি। নয়তো এসব জায়গা কি ছিল। দিনে শেয়াল ডাকতো।

এবার নাড়ু—অনেক কাল পরে তার গিন্নির নাম ধরে গলা কাটিয়ে ডাকলো। ও লাবণ্য। লাবু—

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ঠাণ্ডা গলা ভেসে এলো ওপর থেকে। এখানে এসো।

নাড়ু চমকে গেল। বাড়িতে থেকেও এতক্ষণ কোনো সাড়া দেয়নি লাবণ্য। আশ্চর্য, এ সময় তো লাবু এক তলাতেই থাকে। সেই সন্ধ্যার পর না দোতলায় ওঠে। বাতের ব্যথা। বারবার ওঠানামা করবে না বলেই একেবারে সারারাতের জন্যে ওপরে চলে যায়।

ধুতি সামলাতে সামলাতে নাড়ু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো।

বাইরে হুড়ুমদ্দাম বৃষ্টি। তবু গরম কমে না। কি ব্যাপার ? অসময়ে ওপরে ? একথা বলতে বলতে নাহু ওপরে খেতে বসায় ঢাকা বারান্দায় উঠেই চমকে গেল। তার আলজিভ অব্দি কথা মুছে গেল।

সাধ পূর্ণ হয়েছে এবারে।

লাবণ্যের একথায় কোন জবাব দিতে পারলো না নাহু—।

তোমার অঙ্কও মিলে গেল।

এবারও কোন জবাব না দিয়ে নাহু শী ধুলো-ভর্তি মেঝেতেই বসে পড়লো। তারপর আচমকাই হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে জানতে চাইলো, কি হয়েছিল মা ? আমরা তো কোন খবর পাইনি।

রাধিকা একটুও কাঁদলো না। চোদ্দ পনেরো বছরের ফুটফুটে সরল চেহরার মেয়েটি কাঠের চেয়ারে শান্ত হয়ে ব'সে। পরনে জামা, শুকনো গলায় বললো, দিঘিতে নাইতে নেমে পাতালের মাটি তুলছিল এক ডুবে—

কেন মা ?

বাহাদুরি! ছাখো আমার কত দম। তাই—

তারপর ?

পরনের ধুতি নালাখুলের গোড়ায় জড়িয়ে গিয়ে--

শেষে ?

হো হো করে পুরুষালী গলায় রাধিকা হেসে উঠলো। তথনই তো শেষ বাবা। আমরা কিছু জানিনে। আমিও ঘটনায় দাঁড়িয়ে। ওঠে না। ওঠেনা। শেষে আমার জ্যাস্তো দেওর ডুব দিয়ে তুললো। ততক্ষণে ঘাড় বেঁকে গেছে বাবা—

মেয়ের হেঁড়ে গলায় হো হো হাসি নাহুর কান্না একদম শুকিয়ে দিল। জীবনে এখনো তার সুখ করার কত কি বাকি। নাহু আজই ভাবছিল—জংশন চন্দনেশ্বরের পুকুরগুলো জমা নেবে। নিয়ে

পানিফলের চাষ দেবে। একটা সিনেমা-হল করলে মন্দ না। জগার বাসের কারবারে টাকা ঢেলে তিন চার খানা বাস আনালে কেমন হয়। এসব জিনিস হয়ে গেলে কত সুখ! ইদানীং তার মনেই হচ্ছিল—সুখের পর সুখ—ওই সুখ জমা মেঘের ধারায় তার জন্যে জমা হয়ে আছে। গাছের বোঁটায় ফলা সুখের ফল। শুধু ছিঁড়ে নেওয়ার অপেক্ষা।

কবে এসব হোল?

পরশু। কালই তো সকালে পোড়ানো হোল। গতকাল এসময়ে আমার হাতের শাঁখা ভাঙা শেষ।

তোর গহনাগাটি? জিনিসপত্তর?

আঃ! বলে স্বামীকে থামালো লাবণ্য। যা কিছু ওই পুঁটুলিতে।

দেখেছো?

এখনো খুলে দেখা হয়নি। তোমার অঙ্ক তো মিলেছে!

দাবড়ি দিয়ে উঠলো নাদু। ঠাট্টা রাখো তো তোমার। আমি আমার মেয়ের বাবা। আমার চেয়ে বেশি মঙ্গল ওর কে চায়? ভালো হবে বুঝে যা করিছি—ঠিক করিছি। ভাগ্যির ওপর তো কারও হাত নেই। কে দিয়ে গেল তোকে রাধিকে?

সেই জ্যান্তো দেওর।

তুই চলে এলি কেন?

ওরা রাখতে চায় না।

শ্রাবণের পড়তি বিকেল। তাতে ফের মেঘের সঙ্গে ঘোর বর্ষা। সারা পৃথিবী থেকে নাদুর এ বাড়িখানা এখন আলাদা। চারদিক তাকিয়ে নাদু বুঝলো, জগা এখন ধারে পিঠে নেই। মেঝে থেকে উঠে যে চেয়ারে গিয়ে বসবে, সে শক্তিও নেই নাদুর। জানাশুনো পৃথিবীটা এখন একদম উল্টো হয়ে ঘুরছে। একখানা কাঠের চেয়ারে রাধিকা। আরেক খানাতে লাবণ্য। ফাঁকা

মেঝেতে নাহুর চোখের সামনে সুজনিতে বাঁধা বড় বোচকা টাইপের একটা পুঁটুলি। ঠিক পুঁটলিও বলা যায় না।

চুনীর খুব পছন্দ অপছন্দ আছে। এটোকাঁটার আদাড়ে সে বড় একটা ঘেঁষে না। নেহাৎ খিদের সময় কিছু না পেলে অন্য কথা। ভাদ্র মাসের সবে পয়লা হপ্তা এখন। এখনই তার মনটা কেমন হয়ে যাচ্ছে। এক একদিন সে ধানক্ষেতের আল ধরে দূরে দূরে চলে যায়। সঙ্গে সেই দুই সাঙাৎ। চুনী লেজ নাড়লে—তারা নাড়ে। চুনী দুলকি চালে সবুজ মাঠের ভেতর দিয়ে ঘিয়ে রংয়ের শরীরটা নিয়ে যখন পথ ভাঙে—পেছনে ওরা দু'জনও লেজ তুলে ছোটার চালে চুনীর ভাবখানা তুলতে চায়।

চুনী মাঝ মাঠে থমকে থেমে ফিরে তাকায়। তার চোখ বলে, উ হুঁ। ঠিক হচ্ছে না। ঐ ভাবটা আনতে হলে সামনের ডান আর পেছনের বাঁ পা আড়াআড়ি ফেলতে হবে প্রথমে। সব সময় চিন্তিত ভাব তার মুখে। সারা চন্দনেশ্বর জংশনের মানুষজন—, কুকুর, বেড়াল; লাইনের পাথর-মাটি—সবকিছুর ভালমন্দের ভার যেন তারই মাথার ওপর।

স্টেশন থেকে লাইন পেরিয়ে মাইল খানেক মত এসেছে চুনী। সামনেই টিনে ছাওয়া মানুষজন থাকার কিছু ঘরবাড়ি। তালগুঁড়ির ঘাটলা দেওয়া পুকুর। ধারে ধারে বসানো ওলের সরল সিধে চারা। সকাল ন'টার গাড়ি এখনো যায়নি। এই বস্তিখানা পেরিয়ে আরেকখানা মাঠ। তারপরেই আবার এমন জট পাকানো কিছু ঘরবাড়ি। সেখানে ক'টি একরোখা কুকুর থাকে। গম্ভীর গলার স্বর। লাল চোখ। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। এই ক'দিন আগেই চুনীর সঙ্গে চেনা পরিচয় হয়েছে। কিসের টানে যেন আজ তার ওখানে যাবার ইচ্ছে হচ্ছিল।

কিন্তু আর এগোনো হোল না চুনীর। টিনে ছাওয়া সামনের

ঘরগুলোর উঠোন থেকে একজন মেয়েছেলে ছুটে বেরিয়ে আসছে। তার পেছনে একজন পুরুষ। তার পেছনে আবার আরেকজন পুরুষ।

মাঝের পুরুষটিকে সে চিনতে পারলো। রেল বাজারে সবাই একে দেখলে থমকে চলে। চুনীর পেটে কষে এক লাথি মেরেছিল একদিন। বেয়ারা ধাতের লোক।

খোলা মাঠ। পুকুর পাড়। শিরিশতলা। সব জায়গা জুড়ে ছিপছিপে শরীরের সনকা দৌড়াচ্ছে। হাতের মুঠোয় তার নিজের গলার হার। সুতোর ধারা। ছ'আনা সোনার। ঘষা খেয়ে গলায় নীলচে দাগ পড়ে। ব্রোঞ্জের মিশেল এত।

পরনে ইজের। বর্শার ফলা হয়ে পেছনে পেছনে ছুটছিল বজ্রেশ্বর নস্কর। আর গাল পাড়ছিল। ভাল হবে না কিন্তু। এখনো দে বলছি। ও হার ফুলশয্যের, আমারই দেওয়া।

বজ্রেশ্বরের পেছন পেছন ছুটছিল—তারই আপন বড় ভাই—হৃদয় নস্কর। সেও চেঁচাচ্ছিল। ভালো হবে না কিন্তু। ভালো হবে না বজরা। নিত্যিদিন নিজির বউয়ের গায়ে হাত—

গতিক খারাপ বুঝে চুনী রুট পাল্টালো। খালটা সাঁতরে বাঁ-দিকের বাঁধে উঠলো। উঠেই তার মন নেচে উঠলো। এদিককার পৃথিবীতে কোনো মারামারি নেই। ক'দিনে বর্ষার জল পেয়ে সারা মাঠ সবুজে চুলবুল করছে। তার ওপর ভাদ্রের গা ঘামানো পরিষ্কার চড়চড়ে রোদ। সে রোদের ভেতর একটা কুচকুচে কালো কুকুরের গায়ের গন্ধ।

চুনী আবার তুলকি চালে মাঠে নাচতে লাগলো। এ মাঠটা পেরোলেই সেই অপূর্ব সব কুকুরের দেশ। এটা ভাদ্রমাস। কালো কুচকুচে শরীরে দু'টি করে লাল চোখ। ভরাট গলায় ঘেউ—

হৃদয়কে সবাই ডাকে রিদয়। সে ঠাণ্ডা ধীর স্থির মানুষ। একগাল ঘন চাপ-দাড়ি। চোখ দুটি স্থির। বেঁটে। ঘাড়ে গর্দানে

সমান। মাথার চুল ছোট করে কাটা। কারও সাতে পাঁচে থাকে না। মাসের ভেতর তার দিন কুড়ি হাঁড়ি চড়ে না। বউ আছে। তিনটি বাচ্চা। বয়স জানতে চাইলে বলে, পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময় আমার বয়স ছিল এগারো। হাল নেই। বলদ নেই। ধার ধোর করে এর ওর জমি ভাগে করে বেশির ভাগ দিন চালভাজা খেয়ে কাটিয়ে দেয়। শীতকাল ভর গেরস্থের নতুন পুকুর কাটে বাজার দরে—নয়তো ফুরোনে।

সে বজরার কোমরটা ধরে ফেললো। আর বাড়াবাড়ি করিস নে।

বজেশ্বর নস্করের হাতে যন্ত্রপাতি পড়লে নিশুতি রাতে সে ডাকাত। সবাই তাকে ডরায়। কিন্তু নিজির মানুষজনের কাছে সে নেহাৎ একজন কাহিল লোক। ঠ্যালা দিলে পড়ে যাবে। রাগে রাগে সে চেঁচিয়ে উঠলো। ছেড়ে দে বড়দা। ছেড়ে দে—।

হৃদয় নস্কর ঠাণ্ডা গলায় বললো, ছিঃ। ঘরের মাগের প্রতি এরূপ ব্যাভার অনুচিত।

কথাগুলো পায়ে জুতো পরা ভদ্দরলোকদের মত। বজরা হাসতে হাসতে চোখ তুলে চাইলো। ওঃ। বাবুদের বাড়ি ধান বয়ে দিতি গিয়ে ভালো ভালো কথা শিখে এয়েছো। তিন কড়া পয়সায় ধান তো জোটে না কপালে—

কথাটা নির্জলা সত্যি। খাটুনি আন্দাজে যে ধান ভাগে পায় হৃদয়—তা কিছুই নয়। এর চেয়ে জন খাটলে নগদা মজুরী অনেক বেশী পাওয়া যায়।

রিদয় নস্কর ভাগচাষী। বেশ চওড়া গলায় কথাটা বলে হৃদয় ক'হাত দূরে শিরিশতলায় তাকালো। তার ছিপছিপে ভদ্রবউটি গাছের অষ্টাবক্র শেকড়ে একপা তুলে বসে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। ছুটোছুটিতে কাঁধের কাপড় সরে যাওয়ায় জেগে ওঠা কণ্ঠমণি, কাঁধের পলকা হাড় বুকের ধুকপুকুনির সঙ্গে সঙ্গে উঠছে আর নামছে।

কি হাল করিছিস নিজির বউটার বলতো। বউ হোল গে ঘরের শোভা—

বউদিদির চে তো ভালো আছে। ঝি-গিরি করতি হয়না তো।

সে আমার ভাগ্যি। আমি তো তোর মত কামাইনে! সনেকার তো আরেকটু ভালো থাকার কথা।

সনকা এতক্ষণে ফোড়ন দিল। বেঁচে আছি এই তো যথেষ্ট।

কথাটায় একটা খোঁচা আছে। বজ্রেশ্বর আরেকবার বে করেছিল। সেবারের বউটি সারাদিন ধরে পরিপাটি করে চুল বেঁধে, মুখে তেল মেখে সন্ধ্যে সন্ধ্যে আলুর চপে ফলিডল ঢেলে খায়। সে আত্মঘাতী মড়া শেষে বজরা আর তার স্যাঙাতরা পাঁচ মাইল দূরের থানায় জমা দিয়ে আসে। এমন মড়া কাটাছেঁড়া করার নিয়ম। তাই ওরা এমন ভাবে লাশ ফেলে আসে যাতে পোড়ানোর দায়ও সরকারে বর্তায়। রাতে রাতে সে মড়া পাঁচ মাইল পথ উজিয়ে থানায় দিয়ে আসতে সঙ্গী পঙ্গীদের জন্যে বজরার আড়াইভরি গাঁজা গচ্চা যায়। সেই সঙ্গে এক কেজি বাতাসা।

বসেছিল বজরা। একথায় পটাং করে উঠে দাঁড়ালো। ফের পুরনো কথা।

সনকা তো মিথ্যে বলেনি বজরা।

চড়া রোদে বজরা একবার বড় ভাইয়ের দিকে তাকালো। একবার বর্তমান বউয়ের দিকে। হারটা দে বলছি। ও আমার টাকায় কেনা—

ও তো তুমি আমায় দে দিয়েছিলে।

ওতে বজরা তোর আর কোন উপস্বত্ব নেই। ও হার এখন সনেকার।

বাজে কথা ছাড়ো। ও আমার পয়সায় কেনা আমার জিনিস। আমি তো সনেকাকে একেবারে বিক্রি করে দিইনি।

হো হো করে হেসে উঠলো হৃদয় নস্কর। সে হাসিতে

ছাগলছানা ভড়কে গিয়ে দিল তিনটে তিড়িং লাফ। বিকিকিরির চেয়ে বেশি বোকা। তুই তো ভালবেসে দিয়েছিলি—

ভাসুরের মুখে একথা শুনে সনকা নস্কর গায়ের কাপড়খানা মাথায় টেনে নিল। চোখ মাটিমুখো।

আর তো ভালো বাসিনে।

সে আমি জানি। শুনিছি সব।

সনকার মাথার কাপড় আবার পড়ে গেল। চোখে এবার তার ভাদ্রের রোদের ধোঁয়া-ধরা তেজ। কার জন্যি এ-হার নিবি আমি জানিনে। এখন ভালোবাসার নতুন মানুষ হয়েছে। লুটপাটের গাড়ু কাড়ু সেখানে রাখা হয়।

বজরা তেড়িয়া হয়ে আবার ধরতে যাচ্ছিল সনকাকে। হৃদয় তাকে ধরে ফেললো। বেঁটে খাটো চাপদেড়েল মানুষটা যে খুঁটির মত এতখানি শক্ত তা আগে কোনদিন টের পায়নি বজরা। এমনি লোকে তার বড়ভাইকে বোকাসোকা হাবাগোবা বলে। এমন একটি লোক তার দলে থাকলে বজরা মাৎ করে দিতে পারতো।

এট্টু সৎ হ বজরা।

হবো। মাসকাবারী টাকাগুলো ধরে দিও।

আমি কোথায় টাকা পাবো?

তাহলি আলিপুর সদরে উকিলগের সামনে পায়ে ঘুমুর বেঁধে লেচে এসো। খুশী হয়ে আর টাকা পয়সা, কোটকি পান খাওয়ার সিকি আধুলির নাম কেউ তোলবে না।

এট্টু ভালবাস।

হৃদয় নস্করের একথার ভেতর সেই তিড়িং লাফানো ছাগল ছানাটা আবার এক লাফ দিলো। তাতে বজরা হেসে উঠে ঘরের দিকে ফিরতে লাগলো। কাকে বাসবো?

হৃদয় বুঝলো, বজরার একথা নেহাত মস্করা। তব নিজের কোট

থেকে না নেমে হৃদয় বললো, ছেলেবেলায় তুই তো এমন ছিলি নে। বাবার সঙ্গে মই কাঁধে আউলিয়াপুরের বাজার যেতি। এট্টু সৎ হ। এট্টু ভালবাস। নয়তো বিষম বেপদে পড়বি বজরা—

বলনা। কাকে বাসবো ?

কেন। সনেকাকে। মানুষজনেরে। ওপথ ছেড়ে দিয়ে তুই চলে আয়।

কোথায় যাবো ?

আমার সঙ্গে হাল দিবি। পছন্দ না হয় বিড়ি বাঁধা শেখ। আমরা সবাই মিলে তোরে সৎ করে নেব। এই ভাদ্দর মাসেই তোরে সৎ করে নেব।

হ।

বজরার এই তাচ্ছিল্যে হৃদয় নস্কর একটুও টললো না। সে তখন গলগল করে বলছিল, তাহলি রাত থাকতি সেপাই আসবে না। ফি হপ্তায় আলিপুরের গাটগচ্চা থাকবে না বজরা।

এবারও বজরা সেই একটি শব্দই করলো। আগেরটা ছিল তাচ্ছিল্য। এটা মহাতাচ্ছিল্য, হুঃ! তারপর খুব কাজের লোকের ধারায় বেগে গিয়ে উঠোনে ঢুকলো। মাল চার্জ করা একটা পাইপগানের মুখখানা কেটে ফর্দাফাই। সেখানার পাশটি পাইপ মজুদ। তাই আর উকো নিয়ে বসে পড়লো।

বজরার ভাগ্যে ছেলেপিলে নেই। পাঁচ মাইল বাদে গিয়ে থানা, হাসপাতাল, ছোট আদালত, বটতলা, কাছারি বাজার। এসব জায়গায় সে এলোপাথাড়ি গেছে। কখনো হপ্তায় হপ্তায় ইঞ্জেকশনের জন্যে। কখনো হাল্কা ধরনের মারপিট বাবদে। আবার কখনো রুস্তু কিংবা পতুনের ঘরে মোচ্ছব বসানোর সুবাদে। তখন সে মিনিষ্টার বাংলু খায়। এদেশে ভাল সাধু হলে বলে মিনিষ্টার সাধু। ভালো নেশার দ্রব্যের আগেও মিনিষ্টার কথাটা বসায়। আবার যেমন দেওয়ানকে ডাকে কুকুরদের মিনিষ্টার। আরেকটা কথা

খুব বলে লোকে। মাতৃ-আজ্ঞা। হাজার হোক মা তো। মায়ের কথাটা ফেলতি পারলাম না।

আগে তো বজরা রাসভারি গলায় প্রায়ই বলে বসতো, জানিস। আমার গোপ্তরোগ আছে।

তা যে কারণেই হোক দু'বিয়ে বাবদে কোনবার এখনো সে বাপ হতে পারেনি। চেহারাটিতে তার একটা আলগা লাবণ্য আছে। দিনে দিনে মুখে একটা হাসি। গায়ের রঙ্ ফরসা পানা। চোখ কটা।

কিন্তু রাতে রাতে সে-মুখই শক্ত হয়ে ওঠে। চোখের কোণ কুঁচকে পেরেকের ডগার চেয়েও ছুঁচলো। সর্বদিক নজর রাখতে হয়। চিনির মালগাড়ি ভেবে ডালা ভাঙার পর বেরুলো হয়তো দেশলাই। বেয়ারা গেরস্থ বাড়ি আগুন দিতেই দেখা গেল—জানালার শিক বরাবর বন্দুকের নল। এসব দেখলে হাড় পিত্তি জ্বলে যায় বজরার।

এক সময় ফাঁকা মাঠে বসে থাকতে থাকতে সে আকাশে তারা খসতে দেখেছে নিশুতি রাতে। সে তারাটা তার মাথার ভেতরেই এসে পড়ে। সে মাথায় একটা আগুনের দিঘি আছে। সব খসা তারা এসে জমা হয় সেখানে। হলকা দিয়ে সে আগুন ফুটে উঠে মাথার ভেতরেই ঢেউ দেয়। আর অমনি বজ্রেশ্বর নস্কর অন্ধকার গাঁয়ের মাথায় আগুনে খোদাই করা একখানা জ্বলন্ত গেরস্থ বাড়ি দেখতে পায়। আগুন ধরে ওঠা পাখনা নিয়ে পাতিহাঁস বাড়ির পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

ভাদ্রের রোদের সঙ্গে খুব কোন বাতাস বয় না। গাছের পাতা চুপচাপ। সনেকা কখন এসে ঘোরানো মাটির বারান্দায় কাঠকুটো গুঁজে দিয়ে চুলো ধরাতে বসে গেছে। বউদিদি ভোরের লোকালে গিয়ে শহর যাদবপুরে ঝি খাটে। ফেরে সেই তিনটের ট্রেনে। আঁচলে আটা, চিচিঙ্গে। দু'একদিন পয়সা চায় বজরার কাছে গোপনে।

তার হাবাগোবা দাদাটি তখন গুটি গুটি উঠোনে এসে দাঁড়ালো। মানুষের ছায়া এখনো ছোটো হয়নি। কাঁচা বেলা।

আয়। তুই সৎ হ। আমরা সবাই মিলে তোরে সৎ করে নেব।

ছাড়ো তো! আমি এখন জামিনে খালাস। কে আমারে ছোয়। কার সাধ্যি।

সেদিন রাতেই বাঁশড়ার কাছে রেল লাইনের বাঁকে চেনা পাথরগুলো হালকা পায়ে বেড়াল থাবায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে বজ্রেশ্বর নস্কর শুখো নদীর বুকের ওপরকার ইঁটের থাম্বার মাথায় গিয়ে দাঁড়ালো। বুড়ো মত কয়লাখোর এক ইঞ্জিন তখন সতেরো খানা মালগাড়ি টানতে টানতে অন্ধকার ভাঙছিল। পিস্টনে আর বয়লারে কলজে ফাটানো আওয়াজ। এই থাম্বার গা দিয়ে মালগাড়ি পাস করবে। সেই আটখানা থাম্বার মাথায় বুকখোলা পোল বানিয়ে একসময় নদীর ওপর রেললাইন বসে। এখন এগারটার গাড়ি ধীরে সুস্থে শুখো নদী পেরোয়। ঠিক এইখানের ওপর খটাখট লাইন পালটে মালগাড়ি পোলে উঠছিল। সেই শব্দগুলো দুম দুম আওয়াজ করে বজরার মাথার ভেতর ফাটতে লাগলো। লাইন পাল্টানোর সে আওয়াজ এখন তার মাথার ভেতর সাবান-দেশলাই-চিনি-লোহা—সাবান-দেশলাই-চিনি-লোহা—একদম শেষে শুধু চিনি লোহা, চিনি-লোহা হয়ে হয়ে ফুটতে লাগলো।

ততক্ষণে নিজের অজান্তেই বজ্রেশ্বর নস্কর এক মালগাড়িতে ঝুলে পড়েছে। সে জানে মালগাড়ি এখনই থামলো বলে। কারণ, তাড়দা মামলার রাজসাক্ষী পালান মিস্ত্রীর ছোটভাই বিলে মিস্ত্রী এখন একটা থালাবাটি হাতে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—লাইনের বাঁধ পেরিয়ে একশো গজের মাথায়। নিচে নদীর শুকো বুকে মোষে টানা বড় গোগাড়ি দু'খানা তৈরি। দু'জোড়া মোষ এখন অন্ধকারে ঘাস খুঁজছে।

আর ভাবতে পারলো না বজ্রেশ্বর। তার পরের ওয়াগনে

উঠেছে বিশ্বেশ্বর। সে অন্ধকারের ভেতর চেঁচিয়ে বললো, ও বজরাদা। এ তো শুধু সাবানের পেটি—

নিচে ফেলে দে—ধমকের সুরে বলে উঠেই বজরা ব্যোম দিয়ে সামনের অন্ধকারে একটা বস্তার স্যাম্পেল নিল। গুঁড়ো গুঁড়ো। চিনি না নুন? কে জানে! হে ভগবান। যেন চিনি হয়গো। নয়তো নুনের বস্তা টেনে টেনে শেষে মলে একশা হতে হবে। কেউতো কিনতে চায় না। নুনতো এ-দেশের মাটিতে। জলে গুলে ঘোটালেই কড়ার তলানিতে সাদা ফুটে ওঠে।

জিভে দিয়ে বুঝলো চিনি। অনেক সময় বড় দানার চিনিকে নুন বলে ভুল হয় অন্ধকারে।

ততক্ষণে মালগাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। পেছনের গার্ড সাহেবের হাতে টর্চ। সেদিকে বজরার আরেক সাঙাৎ পাইপগান হাতে ছুটে গেল।

এখন অনেক কাজ বজরার। ঝপাঝপ্ বস্তা পড়ছে। নিচে নদীর বুকের বালিতে। পেটি পড়ছে। গাছ-পালার ভেতর আশেপাশে গাঁয়ের লোক এখন অথৈ ঘুমে। এখন অনেক কাজ বজরার। অন্য কোনো ঘোরাপথে আর পি এফ না এসে পড়ে। তাহলে ওরা ভয়েই এলোপাথাড়ি গুলি চালাবে। মোট দু'গোগাড়ি মাল চাই। তাহলেই যথেষ্ট। এর বেশি একসঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে না। মোষ টেনে টেনে গোগাড়ি তুলবে ঘাসের ওপর। তখন মোষ খুলে দিয়ে বিশ্বেশ্বর ওদের ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলে যাবে। আর বাকি সবাই ঘাসের ওপর দিয়ে মাঠ থেকে গোগাড়ি টানবে। কোন দাগ থাকবে না চাকার। মোটা পাতিঘাস সব দাগ মুছে দেয়। কোন চিহ্ন রাখে না। শেষে রেলবাজার সদরে পৌঁছে গোগাড়ি দু'খানার চাকার দাগ বাকি কতসব গো-গাড়ির চাকার লিকের সঙ্গে একাকার হয়ে যাবে। নাও। ধরো এবারে!

চিনির বস্তা যাবে মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে। দেশলাই সাবান চলে যাবে হোলসেলের দোকানে। খুব সাবধানে মাল আলাদা করে দিয়ে গো-গাড়ির জায়গায় গো-গাড়ি যাবে। শেষরাতে মাছের নীলাম-বাজার বসার আগেই এসব কাজ শেষ হয়ে যাবে বজরার।

একটা পেটি খুলে যাওয়ায় কয়েকখানা সাবান ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছিল। এমন অপচয় একদম দেখতে পারে না বজ্রেশ্বর। তার নিজের মতে ন'টা বস্তা ফেলা হয়েছে নিচে। সে চেঁচিয়ে উঠলো, করিস কি? এমন দামী জিনিস নষ্ট হবে এভাবে?

পাশের ওয়াগন থেকে কোন জবাব পেল না বজরা।

জবাব আসার আগেই আর পি এফ-এর রাইফেল অন্ধকারটিকে থেতো করে দিল।

তিন

সন্ধ্যে ছটা উনত্রিশের ট্রেনে অনন্ত বাঁড়ুজ্যে চন্দনেশ্বরে ফিরলো। পায়ের শাদা রংয়ের রবারের পাম্পস্থ কাদা মেখে মেখে মেটে দশা। ট্রেন এখানেই খালি হয়। আবার এখানেই ভর্ত্তি হয়। অনন্ত নেমেই এগোতে পারলো না। কয়লার আমলের আগুন নেভানোর বালতিগুলো বালিসুদ্ধ ঝুলছে। লোকে এখন তাতে বিড়ি সিগারেট গুঁজে দিয়ে ছুটে ট্রেন ধরে। সেখানকার এক বাঁধানো চাতালে গিয়ে বসলো অনন্ত। তার শাদা গোঁফ স্টেশনের সব আলো অদৃশ্যটানে শুষে নিচ্ছিল। আজ বাড়ি ফেরার উপায় নেই।

জংশন চন্দনেশ্বরের দক্ষিণ পাড়ায় তা আড়াইশো বছর বাঁড়ুজ্যেদের বাস। পাঁচ মাইল দূরে চৌধুরীরা হোলো ভূঁইয়াদের এক ভূঁইয়া। তাদেরই গাতিদার হয়ে বাঁড়ুজ্যেদের অবস্থা সচলবচল হয়ে ওঠে। এখানে জংশন হয় অনন্তর ঠাকুর্দার জেদে। ঠাকুর্দারা তিন ভাই। মেজ ঠাকুর্দার বড় ছেলে অনন্তর বাবার চেয়ে ছোট ছিল। তাকে অনন্তরা রবি খুড়ো বলে ডাকতো। সেই

রবি খুড়োই একদিন বাঁড়ুজ্যে বংশের নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে দেন। তিনি ছিলেন কন্দর্প কান্তি। বেঁচে থাকলে তা প্রায় নব্বই বছর বয়স হোত। এখনকার ছেলেমেয়েরা তার নাম ভুলে গেছে। কিন্তু রবিকাকার নাম একসময় লোকের মুখে মুখে ফিরতো। তিনি ছায়াবাণীতে উমাশশীর অপোজিটে হিরো হয়েছিলেন। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের পর রবিকাকা গত হলেন। মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে। তার আগে একটানা প্রায় পঁচিশ বছর রবি বন্দ্যোপাধ্যায় হিরো ছিলেন। বড়ুয়ার সঙ্গে টক্কর দিয়ে। ছায়াছবিতে তার সোর্ডফাইটিং, ঘোড়া দাবড়ানো দেখে লণ্ডনের ইংরিজি কাগজ লিখেছিল, এরল ফ্লিন অব দি ইস্ট। বট ঠাকুর্দা তখন নেই।

এসব অনন্তরা তাদের উঠতি বয়সে দেখেছে। বাঁড়ুজ্যে বাড়ির ছেলে বলে স্টেজের কাছাকাছি বসার টিকিট পেত। একবার হরিশ্চন্দ্র সাজলো রবিখুড়ো। শ্মশানের দৃশ্য। অন্ধকার স্টেজে হাতে একখানা জ্বলন্ত চেলাকাঠ। রোহিতাশ্বর মড়া কোলে নিয়ে শৈব্যা বসে। উঃ! সে সিন ভোলা যায় না।

ফাঁকা প্ল্যাটফর্ম। পৌনে একঘণ্টার আগে কোন গাড়ি নেই। জংশন প্ল্যাটফর্মে একজন হোমগার্ড ফাঁকা বেঞ্চে শুয়ে শুয়ে ট্রানজিষ্টারের কাঁটা ঘোরাচ্ছিল। ট্রানজিস্টার বলে উঠলো—

এখন জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনতে পাবেন। রাজধানী দিল্লি থেকে প্রচারিত এ ভাষণ প্রথমে ইংরাজীতে তারপর হিন্দিতে শোনা যাবে।

একটা বড় বাদুলে পোকা বাইরের আকাশ থেকে উড়ে এসে শেডের নিচে ঢুকলো। রেলের পথটা ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে। দক্ষিণ পাড়ায় বাঁড়ুজ্যেদের এজমালি বাড়িটাও ভিজে যাচ্ছে। সে বাড়িতে এখন আমরা কেউ থাকি না। বিড়বিড় করেই বললো অনন্ত। ও বাড়িতে বটঠাকুর্দা বিয়ে, শ্রাদ্ধে সারা জায়গার লোকজনকে বসিয়ে খাওয়াতো। এখন ও বাড়িতে প্রধানমন্ত্রীর

বয়সী সব লোকজন থাকেন, তাঁরাও কেউ কেউ হয়তো প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। একটুর জন্য হতে পারেন নি। অন্তত তার ভাবনার এই জায়গাটায় এসে নিজেই একা একা হেসে ফেলল। একটুর জন্যে! যেমন একটুর জন্যে আজ আমি ট্রিপল্ টোট্ মেলাতে পারিনি। মাই ফেয়ার লেডি ঘোড়াটাই আমায় ডোবালো। ফেয়ার লেডির মা বাবার হৈ হৈ নামডাক। ডার্বিতে ওর বাবা একসময় দৌড়েছে। হয়তো খুঁজলে দেখা যাবে—ফেয়ার লেডির ঠাকমার ঠাকমা রবিখুড়োর দিনকালেও দৌড়ে থাকবে। অবিশ্যি রবিকাকা কোনদিন রেস খেলতো না। মদ খেতো। হিরোইনরা আমাদের ওই পৈতৃক বাড়িতে বেড়াতে আসতেন। দোলের দিন সন্ধ্যেবেলায় নয়তো আচমকাই একদিন চন্দ্রাবতী এসে ছিলেন। আমরা তখন ছোট। দোতলার বারান্দায় চন্দ্রাবতী রবিকাকার কী কথায় হেসে উঠলেন। দক্ষিণ পাড়ার রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে সে হাসি দেখছিল।

অনন্ত বাঁড়ুজ্যের কানে প্রধানমন্ত্রীর হিন্দিভাষণ ঢুকে যাচ্ছিল। মাথার ভেতরকার কমপিউটার সঙ্গে সঙ্গে তা বাংলা করে ফেলছিল। যেমন—

আগামী পাঁচ বছরের ভেতর আমরা বিশ লাখ নতুন কাজ জোগাড় করবো।

অনন্ত মনে মনে বললো, প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মশাই। একটা কথা বলি। আপনি কিন্তু রাগ করতে পারবেন না। আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা গান্ধীজী কি জয় বলেছিলেন—জেলে গিয়েছিলেন—তাঁদের প্রায় সাঁইত্রিশজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এখন আমাদের এজমালি বাঁড়ুজ্যে বাড়িতে থাকেন। সরকারের পেনশন-ভোগী তাঁরা। বাড়িটা সরকার কিনে নিয়ে—ওঁদের জন্যে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। সকালে চা মুড়ি। দুপুরে ডাল ভাত মাছ তরকারির মিল। বিকেলে দুধখই। আবার রাতে চারখানা রুটি, কুমড়োর

ঘ্যাট, মুশুরির ডাল। ওরা কেউ হয়তো প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। পারেননি একটুর জন্যে। তাই ওরাও হয়তো ট্রানজিস্টারে আপনার ভাষণ শুনছেন। বৃষ্টিতে ভিজে জিওল গাছের আগায় এসময় কখনো কখনো ঝোড়ো বাতাসে ছিটকানো চড়ুইছানা লটকে যায়। কাঁচা জিওল আঠায় বন্দী পাখির ছানা তখন ভিজতেই থাকে। একটুর জন্যে তার আর বাঁচা হয় না।—

তার নিজের মাথা এত সুন্দর করে ভাবতে পারছে দেখে অনন্ত বাঁড়ুজ্যে অবাক হোল। কিন্তু তার তো এখন বাড়ি ফেরার কোন উপায় নেই। রোজ সে ভাবে—আজ নিশ্চয় ভাগ্য খুলে যাবে। কথাই তো ছিল—পঁচিশে শ্রাবণের পর বৃহস্পতির প্রবেশ। ভাগ্য মুখ তুলে চাইবে। কিন্তু কোথায় চায়! বরং সে তো তলিয়েই যাচ্ছে।

বাড়ির উঠোনে একরকমের ঘাস হয়। সে ঘাস চেঁচে মুছে কিনে নিয়ে গেছে ঘেষুড়েরা। কোনো কেমিক্যাল কোম্পানীর কাজে লাগবে। ঘাস সেদ্ধ জল দিয়ে ছুলির ওষুধ বানাবে। সেই সঙ্গে ষোলটা টাকা এসেছিল সংসারে। সেই টাকা হাতে তুলে নিয়ে গিন্নি বলেছিল, এইবেলা কিছু গাঠি কচু আর আলু কিনে রাখো। বিপদের সময়ে কাজে আসবে।

কিনতে বেরিয়ে অনন্ত বাঁড়ুজ্যে নটা চুয়াল্লিশের গাড়ি ধরে শেয়ালদার উল্টোদিকে বুকির কাছে চলে আসে।

বিকেল পাঁচটার ভেতর হাত ফরসা। ভেণ্ডার. কামরায় চড়ে একদম খালি হাতে এই এসে নেমেছে অনন্ত। ভেবেছিল, আজ নির্ঘাৎ লাগিয়ে দেবে। সারা জীবনের পোড়া ভাগ্যটা আজই রিপেয়ার করে ফেলবে। এখন বাড়ি ফেরে কোন্ মুখে! প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে সেই তো নাড়ুর গদির সামনে দিয়ে রেল বাজার পেরোতে হবে। আরো একটা পথ আছে। রেল লাইন ধরে রেল গেট। তারপর ভিড়ে মিশে গিয়ে বাসরাস্তা ধরে দক্ষিণ পাড়ার মোড়।

সেখান থেকে বাড়ি হাঁটা পথে দশ মিনিট। কিন্তু রেললাইন থেকে ওই পথটুকুতে সেলুনগুলো সারাদিনের কাটা চুল ফেলে। আর ফেলা হয় ভাতের হোটেলের ডিমের খোসা। পোড়া কয়লার ছাই

ট্রেনের ভিড় মুছে গেলে অনন্ত বাঁড়ুজ্যে গুটি গুটি হাঁটা ধরলো রেলবাজারের সদর দিয়ে। নাদু শী দফায় দফায় অনেক টাকা পায়। বেশির ভাগই লিখে নেওয়া। দু একবার না লিখেও নেওয়া আছে সাতবিঘের ভাগের ধান পর পর দু'মণ দেওয়া হয়নি নাদুকে। সেই ধান বাদেও নাদু বাজার দরে টাকা লিখে রেখেছে। সই দিয়েছে অনন্ত।

যেতে গিয়ে নাদুর চোখে পড়ে গেল অনন্ত। সে-চোখে তাকালে হার্ট-ফেলের দশা। শান্ত, মোলায়েম। কোন পলক পড়ে না নাদুর। অনন্তর বিশ্বাস, নাদু সূর্যের দিকে তাকাতে পারে। কোন পলক পড়বে না তার।

অনন্ত এগিয়ে গিয়ে বললো, কেমন আছে মেয়েটা?

নাদু আস্তে বললো, ভালো।

শুনলাম—জিনিসপত্তর কিছুই দেয়নি।

না। ভুল শুনেছেন বাঁড়ুজ্যে মশাই। কিছু কিছু দিয়েছে।

তাও তো কিছু আটকে রেখেছে।

এখন শোকের সময় বাঁড়ুজ্যে মশাই। আমি কি গিয়ে খাট-পালঙ্কের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়বো!

পরে লোক দিয়ে আনিয়ে নিও। স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী-ই ওসবের ওয়ারিশান। তুমি আনিয়ে নাও নাদু। জামাই যখন নেই তখন ও সবেরই মালিক তোমার মেয়ে।

ব্যাপারটা বুঝলো শুধু শশী পাকরাশি। বাঁড়ুজ্যে মশাই এখন কিছুতেই নাদু শীকে তার ভাগের ধান কিংবা অন্যসব পাওনা গণ্ডার কথায় আসতে দেবে না। এলেই তো ফাঁক-ফোকরগুলো ধরা পড়ে যাবে।

শশী হাপর থামিয়ে বললো, উনি তো ভাল জাতের ব্রাহ্মণ। ওকেই বলুন না।

নাড়ুর কি মনে পড়ে গেল। বলতে সবে শুরু করেছে। অনন্ত বাঁড়ুজ্যে তাকে থামিয়ে দিল। কেন শুধু শুধু লজ্জা দিচ্ছো শশী। গরীবের আবার ব্রাহ্মণ কিসির! গরীব হয়ে গেলি কোন জাত থাকে না।

কি বললে বাঁড়ুজ্যে মশাই! এবার নাড়ু সোজা হয়ে বসলো গদীতে। পুরাণকথা—ব্রতকথায় সব বেরাহ্মণই তো গরীব। তাই বলে কি তাদের জাত গেছে?

ওসব গল্পকথা জমিয়ে বলার জন্যে ব্রাহ্মণকে গরীব বানাতে হয়।

কলকাতায় আজ বড় জমায়েৎ ছিল ময়দানে। তার এক লট বাসে বাসে চন্দনেশ্বর ফিরলো। ঘামে গরমে বর্ষায় সবার স্যাতানো দশা। খুচ খুচ ক'রে জিন্দাবাদ দিচ্ছিল ক'জন। তারা পার হয়ে গেলে নাড়ু বললো, ওসব কথা থাক বাঁড়ুজ্যে মশাই। একটা কথা বলুন তো। অপঘাতে মারা গেলে জাতক ফের জন্মায়?

অনন্ত অবাক হয়ে তাকালো। নাড়ুর মুখে এ প্রশ্ন? অনন্ত বড় বাড়ির ছেলে। সে বিশেষ পড়াশুনো করেনি। অল্প বয়সেই বয়ে যায়। তারপর অবস্থাও পড়ে যায়। সে নিছক শেখেওনি। জানেওনা। ঠিক করতে পারলো না কি বলবে। সন্দেহ হোলো—তার এই জবাবের ওপর নাড়ুর অনেক কিছু নির্ভর করছে। ফট করে বললো, দাঁড়াও। ভেবে দেখি।

ও শশী বেঞ্চিটা এগিয়ে দাও না।

অনন্ত বাঁড়ুজ্যের আজ মাথায় কুকুর কামড়ানোর দশা। শুধু হাতে তো ফেরার উপায় নেই বাড়ি। আন্দাজে বসে ফেললো, অপঘাতে মরলে তো সহজে জন্মায় না নাড়ু।

বাঁচালে বাঁড়ুজ্যে মশাই।

একথা বলছো কেন ?

রাধিকে গর্ভবতী। ও স্বপ্নে দেখেছে ওর স্বামী ওরই কাছে ফিরে আসতে চাইছে।

এসময়ে অমন স্বপ্ন সব জাগে। ওর কোন গুরুত্ব দিও না। তার চেয়ে বরং—

থামলেন কেন বাঁড়ুজ্যেমশাই ?

দ্যাখো নাহু। আমাদের কাল তো কেটে গেল। যাদের সামনে এখন ভরা জীবন—তাদের জন্যে অন্য ভাবে ভাবা উচিত।

বুঝতে পারলুম না।

রাধিকের তো কাঁচা বয়স। এখনো বিরাট জীবন সামনে পড়ে আছে। ওকে তুমি ফের বিয়ে দাও।

দিতাম। কিন্তু পেটেরটির কি হবে।

ওকে বড় করুক। বছর ঘুরলে পাত্তর দ্যাখো নাহু। আমরা বুড়োধুরোরা মাছ মাংস খেয়ে কাল কাটাবো। আর সোনার প্রতিমে নিরিমিষি থাকবেন ?

ছেলে পাই কোথায় ?

তুমি জোগাড়ে মানুষ নাহু। তুমি ঠিক পাবে। তার ওপর তোমার টাকা আছে।

রাস্তায় লোক চলাচলের বিরাম নেই।—

এখন দেখছি টাকায় কিছু হয় না।

কে বললো হয়না। তুমি টাকা ফ্যালো, আমি পাত্তর দেখছি। পথ খরচা, খাইখরচা দাও—আমি ঘুরে ঘুরে ঠিক ছেলে বেছে বের করবো। আমার আর কাজ কি এখন! এই বয়সে তো লোকের ভালো করে বেড়ানোই আমার কাজ হয়ে দাঁড়াবে। তাই কি না ?

শশী ফোঁড়ন কাটলো। সে টাকা যদি ঘোড়ার লেজে বেঁধে বসেন ?

সব সময় রসিকতা ভালো লাগে না শশী।

অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গম্ভীর মুখ লাল দেখে নাড়ু শী বললো, কত দেব ?

এতটা আশা করেনি অনন্ত। তার হাত আর ঠোঁট দুই-ই কেঁপে উঠছিল। একদম বুঝতে না দিয়ে বলে বসলো, দাও আশিটে টাকা। ঘুরে দেখি একবার। এসব তো সঙ্গে সঙ্গে হয় না। দেখাশুনো কথাবার্তা চালাতে হয়।

তা তো বটেই। এই নিন—

বুক পকেট থেকে বের করে দিল নাড়ু। অনন্ত গুণে নিতে নিতে দেখলো, নাড়ুর সেই কড়কড়ানি কথাবার্তা কোথায় গেল। এ নাড়ু তো অন্যরকম। তার কাছে নাড়ুর সাত রকমের পাওনা। সে সব কথা তো আজ একটাও বললো না।

একটু আগে অনন্ত বাঁড়ুজ্যের কাছে জংশন চন্দনেশ্বর সবরকমের আশা ভরসার কবরখানা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এখানে তার বাপপিতেমহর দপদপার ছাপ সব জায়গায়। আর সে নিজে সে বংশের এক টিকটিকি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সামনে কোন আশাই ছিল না অনন্তর। খালি হাত। রেসে আজ সে সর্বস্বান্ত। উঠোনের দামী ঘাসও বেচা সারা। মায় বাড়ির পুকুরটা অন্যকে জমা দিয়ে বসে আছে। শুধু জল ঘাটার অধিকারটুকু হাতছাড়া করেনি অনন্ত। তাও তার গিন্নির কথায়। সরোজপ্রভা জংশন চন্দনেশ্বরের দক্ষিণ পাড়ায় বিয়ে হতে এসেছিল চল্লিশ বছর আগে। তখন তার বয়স পনেরো। সে এখানকার বাতাস অব্দি দেখতে পায়। উড়োনচণ্ডী স্বামীকে তার ভরসা এখন কম। এই বয়সে বাড়ির পুকুর থাকতে অন্য কোথায় জল আনতে যাবে ? তাই পুকুর জমা দেওয়ার সময় এ স্বত্বটুকু সে আঁকড়ে থাকে। তার দরুণ অবশ্য দেড়শো টাকা কম পেয়েছে পুকুর বাবদে।

সত্তর পয়সায় একটা খালি বস্তা কিনলো অনন্ত। তারপর ভাঙা

বাজারে ঢুকে লম্পর নিচে বসা গাঠিকচুর ডাঁইতে বস্তাটা ফেললো। বর্ষায় কেউ কচু খায় নাকি!

অনন্ত জানে, এদিকটা নাতুর চোখ পড়বে না। তিরিশখানা দোকান পেরিয়ে তবে নাতুর গদি। আর এও জানে, খুব অভাবী লোক ছাড়া এ সময়টায় কচু, কচুর লতি, ঝোল কিংবা গাঠিকচু নিয়ে বাজারে বসে না। সস্তায় তিরিশ কিলো মাল নিয়ে রিক্সোয় চাপালো। মোটা চালটা কিনবে কাল সকালে। এখন দক্ষিণ পাড়ার রাস্তায় তাকে নিয়ে তেচাকা রিক্সাওয়ালা বললো, আমি কিন্তু ভাড়া বাকি রাখতে পারবো না।

হ্যাঁ। হ্যাঁ। কে বাকি রাখছে তোর ভাড়া—

দু'বার আপনি ঘুরে আয় বলে ঘুরিয়েছেন। এবার কিন্তু দিতিই হবে।

নিবি। খুচরো আছে তো?

কত টাকার?

দশ টাকার।

দিন। এই কেরোসিনের দোকান থেকে ভাঙিয়ে নেব।

চল না। দেওয়া যাবে। নিজির দাদুর বয়সী একটা লোককে নিয়ে যাবি। পারবিনে?

ও সব দাদু ফাদু ছাড়ুন। রিক্সাওয়ালা অন্ধকার রাস্তায় ব্রেক কষলো।

পাগল হলি নাকি! কচু কিনে টাকা ভাঙালাম—

বাকিতে নিয়েছেন।

ওরে না পাগল। গরীব ব্রাহ্মণ কখনো ঠকায় না।

ব্রাহ্মণরাই বেশি ঠকায়। বলতে বলতে ছোকরা-রিক্সাওয়ালা প্যাটেল করলো।

অনন্ত বাঁড়ুজ্যের ভীষণ ফুর্তি হচ্ছিল। সে জানে, ছেলে ছোকরাদের কথায় বেশি জবাব দিতে নেই। হ্যাঁ—হো—আ—

বলে কাটিয়ে দিতে হয়। তার পকেটে সন্ধ্যেরাতের অন্ধকারের বদলে এখন পরিষ্কার ক'খানা দশটাকার নোট। রাধিকে মেয়েটা বড় ভাল। ফুটফুটে। ভগবানও যেমন! এমন মেয়েকে কেউ বিধবা করে? তায় গর্ভবতী।

সারা দক্ষিণ পাড়ায় ইলেকট্রিক, নেই শুধু এ-বাড়িতে! টেমিটা নিভে গিয়েছিল। গেটের ভেতর একটা হাবাতে বুড়ো টগর শাদা শাদা ফুল মেলে দাঁড়ানো। অনন্তর পৈতৃক ভিটেয় শুধু উইপোকার বাসা। আগে তবু জানলা দরজা সাফসুতরো করে আলকাতরা মাখাতো শীতকালে। এখন আর ওসব করা হয় না ক'বছর। সরোজপ্রভা বারান্দা থেকেই বললো, এসেছো!

অনন্ত কোন জবাব না দিয়ে রিক্সাওয়ালাকে বললো, বস্তাটা একটু ধরে দিবি। আমি বুড়ো মানুষ।

আগে ভাড়া দিন।

ভাড়া তো দেবোই। আরো দশ পয়সা বেশি দেব।

রিক্সা চলে যেতে সরোজপ্রভা বললো, এতটা কিনলে। টাকায় হোল?

সস্তা যাচ্ছে তো। তুমি খেয়েছো?

কখন খেলাম। তুমি সকালে বেরিয়ে তো এই এলে।

আঃ। আমি কত কাজে ঘুরি। তুমি তো খেয়ে নেবে।

সরোজপ্রভা আর কথা না বাড়িয়ে ভাত বেড়ে দিল শোবার ঘরে। ভাল ঘর বলতে একখানাই। আরেক খানা ঘরে আগে গাই রাখতো অনন্ত। তা সেই গাই বেচে দিয়ে তো ফক্কা। এখন তার সুরকি ছাদ খুলে দিয়ে আকাশ উঁকি দেয়। উপস্থিত বৃষ্টি বেশি হলে জল ধারা দিয়ে নামে। নয়তো ফাগুন মাসে ঘরখানা চলাফেরা বসার পক্ষে দু'-জনেরই প্রিয়। জ্যোৎস্না রাতে অনেক সময় ঘুম ভেঙে গিয়ে সরোজপ্রভা ওখানে বসে থাকতো। ইদানিং

আর তা হয় না। গত মাসের বর্ষার গোড়ার দিকে একটা চিতি সাপ উঠেছিল।

খেতে খেতে অনন্ত বাঁড়ুজ্যে জানতে চাইলে, এ কুচো বড়ি পেলে কোথায় সরোজ ?

অনেকদিন পরে শুধু সরোজ ডাকায় আলাদা একটা আনন্দ সরোজপ্রভার। এ ডাক তার বধূ জীবনের গোড়ার দিককার। তখন অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু সরোজ নয়তো শুধু প্রভা বলে ডেকে বসতো। ধান চালের দাম এত বাড়েনি তখন। শাশুড়ি বেঁচে।

গত সনে দিয়ে রেখেছিলাম। আর দু'টো দোব ?

দাওতো। তোমার আছে তো ?

অনেক আছে।

তার মানে আর নেই প্রভা।

তুমি খাও তো। এই তো কত গাঠি এনেচো। বর্ষাটা ধরলিই নাবাল থেকে মাছ ধরে দেবে গামছা দিয়ে।

দু'জনে কথা বলছিল আর সেই সঙ্গে বৃষ্টি পড়ছিল। মানকচুর বড় পাতায় তার বড় ফোঁটার বড় শব্দ। খেতে বসে থালা চেটে খাওয়ার শব্দও উঠছিল। সরোজপ্রভার চোখে জল এসে পড়ার অবস্থা। সে বিয়ে হয়ে এসে এবাড়িতে কালো পাথরের থালায় শাদা জুঁইফুল ভাত বেড়ে দিত। পাথর ছাড়াও কাঁসা ছিল। ছিল অনেক। তার একখানাও এখন নেই। বাঁড়ুজ্যেদের বড় তরফ মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে জমিদারির উদ্দেশ্যে ক্ষতিপূরণ পায়। কলাই থালায় পালিশ চটে গিয়ে কালো বেরিয়ে পড়েছে। আমরা বাকি কয়েকটা টাকাও ক্ষতিপূরণ পেতাম—

আঁচাতে গিয়ে ঝাঝিয়ে উঠলো অনন্ত। তুমি আবার জল তুলে রেখেছো কেন ? এখন তো চারদিকেই জল।

তারপর কি মনে হতে অনন্ত বারান্দায় এগিয়ে গেল। বারান্দার ছাদের খানিকটা টিনের। তার ঢেউ দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে জল

নামছিল। তাতে হাত ধুয়ে নিয়ে বললো, তোলা জলটুকু থাকুক, তোমার লাগবে।

সরোজপ্রভা খেতে বসেছিল। এ-বাড়িতে বহুকাল তারা দুই প্রাণী। শাশুড়ি বেঁচে থাকতে বংশরক্ষা হচ্ছে না বলে কাঁদতেন কাটতেন। তখন অনন্তর ভরা বয়স। অনন্ত গা করলে কি আর তার ফিরে যে হোত না!

শুতে গিয়ে সুতুলীর ভেতর থেকে কি ফুটছিল গায়ে। সরোজপ্রভা মশারি টানাচ্ছিল। বালিশে তুলো ধমসে গিয়ে এখন আর মাথায় দেবার উপায় নেই। কোন্‌কালের বাঁধানো দুখানা ভারতবর্ষ বালিশের নীচে এগিয়ে দিল সরোজ।

কাল এক বস্তা চাল কিনে ফেলবো। কি ফুটছে পিঠে ছাখোতো।

সরোজ হাতড়ে হাতড়ে একখানা ভাঙা ঝাঁটার কাঠি পেল। সেখানা বের করে দিয়ে বললো, সকালে বেরিয়ে এত দেরিতে ফিরলে?

কলকাতায় গেলাম যে—আজ খেলা ছিল। মাই ফেয়ার লেডি—

সরোজপ্রভা জানলার বাইরে ভিজে জ্যোৎস্না ফুটেছে দেখতে পেল। আচ্ছা—ছাখো। তোমার ওই ঘোড়াগুলোর নাম কিন্তু খুব সুন্দর।

আজ দৌড়েছেও খুব সুন্দর। নয়তো এত টাকা পাবো কোথায়?

তুমি জিতেছো তাহলে—

অনন্ত বাঁড়ুজ্যে খুব আগ্রহ না দেখিয়ে মরা গলায় বললো, আমার মত ঘোড়া বোঝে ক'জন।

বৃষ্টি আবার ঝেঁপে এলো। বারান্দার টিনে চিটির-পিটির, এক নাগাড়ে। খানিকবাদে দু'টো ছুঁচো দৌড়োদৌড়ি শুরু করে দিল

ঘরময়। তখন বৃষ্টির ধাঁচ পাতলা। অনন্ত বাঁড়ুজ্যে তার ঘুমের ভেতর বাঁড়ুজ্যেদের পৈতৃক বাড়ির দোতলায় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। ছায়াছবির হিরো সেই খুড়োমশাই চন্দ্রাবতীকে এক কাপ চা এগিয়ে দিচ্ছেন। কাপের ওপর নীল রঙের ধোঁয়া পাক দিয়ে ওপরে উঠছিল। নিচে দক্ষিণ পাড়ার লোকজন চন্দ্রাবতীকে দেখার জন্যে দাঁড়ানো।

ওগো, শুনছো। ওঠো—

কে? বলতে বলতে অনন্তর ঘুম ভেঙে গেল।

ছুঁচোর জ্বালায় শোয়া হচ্ছে না।

ওই যে কচুর বস্তা এনে রেখেছি। ওগুলো না খেলে নয় ওদের এখন। ঘুমোও। ঘুমিয়ে পড়।

ঘুম আসছে না। বলে খানিক চুপ করে থাকলো সরোজপ্রভা। তারপর উঠে বসে অনন্তর বুকে হাত রাখলো। ঘুমিয়ে পড়লে? বলেও কোন জবাব পেল না।

খানিকবাদে সরোজপ্রভা খুব আস্তে ঝাঁকুনি দিল অনন্তকে।

কি ব্যাপার?

জেগে আছো?

জাগিয়ে দিলে তো। কি ব্যাপার?

ও টাকা তুমি ঘোড়া খেলে পাওনি। আমায় মিছে কথা বোলো না।

দু'জনে কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। মশারির বাইরেই মেঝের ওপর এক চৌকো ঝকঝকে জ্যোৎস্না।

নাড়ু দিল।

আবার ধার করলে। কেন যে টাকা দিলাম—তার ভেতরেই থাকলে পারতে—

সে টাকার বাজি ধরেছিলাম। কলকাতা থেকে ফিরেছি সন্ধ্যের ট্রেনে। খালি হাতে—

ধার করে আবার কি লিখে দিয়ে এলে। আমাদের জোত জমিও তো নাছুর হাতে বাঁধা। খিড়কির পুকুর, সামনের ধানজমি —এ বাড়ি—সবই তো নাছুকে লিখে দিয়েছো।

ওজন্যে কোন চিন্তে নেই। নাছু তো আর আমাদের উচ্ছেদ করছে না।

সে ওর দায়। কিন্তু যদি বিগড়োয়। তখন? আজ আবার কি লিখে দিলে?

কিছু লিখি নি। নাছু একটা কাজের ভার দিয়েছে।

কি মুশকিল। তুমি আবার কি কাজ করবে! এই বয়সে বন্ধকী কারবারে কাজ নিলে!

চুপ করো তো প্রভা। টাকা না দিলেও এ কাজের ভার নিতাম। নাছুর সেই বিধবা কচি মেয়েটা—ওর জন্যে পাত্র খুঁজে বের করবো। বন্ধকী করুক—আর যাই করুক—মেয়ের বাপতো।

সরোজপ্রভা খানিক চুপ করে থাকলো। তারপর বললো, আজকাল তো বিধবা বে হচ্ছে। মেয়েটাতো শুনি পোয়াতি। নাছুর পুকুর ঘাটলায় ওকে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে দেখেছে কারা।

জংশন চন্দনেশ্বরের আশপাশে এখন শুধু মালগাড়ির গার্ড সাহেব, ড্রাইভার জেগে। চুনী কাঁচামুখে জেগে উঠে হোলসেলের দোকানের বারান্দায় গিয়ে গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়ার চেষ্টা দেখছিল। পিচরাস্তা থেকে কয়েক পা ভেতরে নাছুর ঘরে টেবিল ল্যাম্পের আলো তখনও নেভেনি।

বিধবা হয়ে তক মেয়েটা মাঝে মাঝে মুছা যায়। পাশের ঘরেই রাধিকা তার মায়ের সঙ্গে শুয়ে। নাছু ঘরের দরজা খোলা রেখেছে। হঠাৎ যদি কিছু হয় তো সে ছুটে পাশের ঘরে যাবে। রাতে খাওয়ার ইচ্ছে আর হয় না আজকাল। জেগে বসে পুরনো হিসেব দেখছিল।

দেখতে দেখতে হিসেবের খাতায় গত সনের একটা গুণ অঙ্ক চোখে পড়লো। নিজের হাতের লেখা চিনতে পারলো নাতু। একশো একাত্তর গুণ বারো গুনিতক সাত।

এই তিনটে অঙ্কই তার চেনা। তারই হিসেব করা সব অঙ্ক। মাস গেলে. রাধিকা বাবদে খরচ ধরে ছিল—গত মাসের বাজার দরে খাওয়া-দাওয়া, শাড়ি-ব্লাউজ, পড়াশুনো. স্নো-পাউডার, দুধ, প্রাইভেট মাস্টার—একশো একাত্তর টাকা। বারো মাসের খরচা বের করে তাকে সাত দিয়ে গুণ করেছিল। মানে রাধিকা যদি আর সাত বছর বাড়িতে থেকে পড়াশুনার পর বিয়ে বসে—তাহলে সেই খরচা দাঁড়াবে কত। তার মেয়ের কচি বয়সে ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দিলে এই সাত বছরের খরচাটা তো বেঁচে যায়। এখন বিয়ে দিলেও তো খরচ। পরে বিয়ে দিলেও খরচ। তাহলে শুধু শুধু খাইয়ে দাইয়ে বড় করার খরচ বওয়া কেন। পাশ দিয়ে তো রাধিকা হাকিম হতে যাচ্ছে না।

এই অঙ্কই তখন কষেছিল নাতু। ছেলেটাও ভাল পেয়ে গেল।

আর এখন? লাবু ঠিকই বলেছে—তোমার অঙ্ক এবার মিলে গেল তো!

নাতুর অঙ্কটা এখন আগাগোড়াই অমিল। বিয়ের খরচা হোল মেয়েও ঘরে ফিরে এল। পেটের ভেতর আরেকজনকে নিয়ে। সে বাচ্চা বিয়োবে। খানিকটা বড় হবে। তারপর তো ফের রাধিকের বে দেবার কথা। তখন আরেক দফে খরচা। আর এ অবস্থায় বে করবার মত পাত্তরও তো চাই। অবিশ্যি বাঁড়ুজ্যে মশাই তো বলে গেল—পাত্তর ঠিক খুঁজে পাওয়া যাবে। তাহলে সেই বে-র খরচা দোবারা। থাকা খাওয়ার খরচাও গিয়ে দাঁড়ালো ডবলে। ভাল অঙ্ক কষেছিলাম!

এবার নাতুর সব দিক দেখে শুনে এগোতে হবে। এই তো বয়স রাধিকার। চোখের সামনে সে তার একমাত্র মেয়েকে শাদা

থান পরতে দেয়নি। বিয়ের সময়কার নউগোদায় পাওয়া কিছু শাড়ি মেয়ের মা তুলে রেখেছিল। তারই একখানা ধনেখালি বের করে দিয়েছে লাবণ্য। এটা পরে থাকবি। আমি তোকে থান পরতে দেব না।

মেয়ে খাবে না বলে নাহু বাড়িতে আর মাছ মাংস ঢুকতে দেয়নি। জগা তার টুরিস্ট বাস নিয়ে পয়লা ট্রিপ দেবে। তার দু'চারদিনের ভেতর। সে-ও নিরিমিষি ধরেছে। এসব আর চোখে দেখা যায় না। কী ভাগ্য নিয়েই জন্মেছে মেয়েটা। এসব চোখে দেখার জন্যিই কি টাকা কামালাম!

মেয়ে জামাইয়ের ক'খানা ছবি ছিল বাড়িতে। নাহুর পরামর্শে লাবণ্য সেসব ছবি সরিয়ে দিয়েছে। আজকাল নিজেও নাহু বেশীক্ষণ বসে না গদিতে।

নিজের কারবারে নেমে জগা এখন লায়েক। একবার নাহুকে বলেছিল, চলো বাবা। রাধিকেও চলুক। কত দেশের ভিতর দিয়ে আমার টুরিস্ট বাস যাবে। বক্রেশ্বরটা ঘুরে আসবে সবাই। এখন তো আর গরম নেই। বর্ষা পড়ে গেছে। ঘুরলে মনটা প্রফুল্ল হবে—

রঙ্ করানো শেষ?

চেছে রঙ্ করালাম বাবা। দেখলে মনে হবে নতুন বাস। প্যাসেঞ্জার পঁয়ত্রিশের বেশি নেব না। বাকি ন'টা সিট কাজের লোকের জন্য।

ন'জন কাজের লোক?

হ্যাঁ। তাতো লাগবেই। রান্নাবান্নার লোক চারজন। চাকর দু'জন। আর তিনটে সিট আমার নিজের জন্যি রেখিছি। বলা তো যায় না—কার কখন লাগে।

কচাং করে কিসের শব্দ হতে নাহু শী আলো নিভিয়ে দিয়ে করিডরে এলো। ঢাকা করিডরে বড় বড় জানালা। বাইরে

গাছপালার গা দিয়ে সবসময় টপ টপ জল ঝরছে। লাবণ্যের পাশে মেয়েটা শুয়েছিল। কোথায় গেল? নান্টুর বুকের ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠলো। আমিও তো বাবা হয়ে এই বয়সে চুটিয়ে সংসার ধর্ম করে যাচ্ছি। আর কচি মেয়েটা সব কিছু থেকে বাদ পড়বে? এই সামান্য বয়সে? বঞ্চিত হয়ে থাকবে। ও রাধু। রাধুরে—

ছোট গলায় ডেকে দেখলো নান্টু। কোথায় যেতে পারে। ঘরে তো নেই। করিডরটা ঘোরানো। নান্টু তার পাশের ঘরে দক্ষিণ দিকে গিয়ে দাঁড়ালো।

রাধিকা জানালার শিক ধরে দাঁড়ানো। বাড়ির বাইরে একদম কাঁচ জ্যোৎস্না ধবধবে পরিষ্কার। নিশুতি রাতে বাড়ির গায়ের জঙ্গল, লতাপাতার ভেতর দিয়ে অজানা প্রাণী সড়সড় করে সরে যাচ্ছে।

নান্টু এগিয়ে গিয়ে কাঁধে হাত রাখলো। শুয়ে পড়বি। আয় মা—

রাধিকা নড়লো না।

শুয়ে পড়বি চল। শুধু শুধু রাত জাগে না।

ও এসেছিল।

কোন তর্কে না গিয়ে নান্টু বললো, শুয়ে পড়ো মা।

আমি পরিষ্কার দেখলাম। শেষ সময়ে দম আটকে গিয়েছিলো তো। মুখ নাক পোড়া পোড়া। ওপরের চোকলা উঠে যাচ্ছে। খুব কষ্ট পেয়েছিলো বাবা।

ওসব ভুলে যা মা—

স্পষ্ট দেখলাম বাবা। একতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে এই করিডরে। তারপর আমাদের দরজার সামনে। আমি যে-ই না উঠেছি—অমনি জানলার ওপারে চলে গেল—

ওসব ভুলে যাও রাধিকা। তুমি এখন মা হবে। তোমার সামনে কত দায়িত্ব—

ও আমার সঙ্গে একটাও কথা বললো না বাবা।

ও তোর চোখের ভুল রাধিকে। ভুলে যা ও সব। আয়। শুয়ে পড়বি। জল খেয়েছিস ?

মাথা নাড়ালো রাধিকা। শুতে গিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। লাবণ্য তখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। কাল আমায় একটা জিনিস কিনে দিতে হবে বাবা।

যা চাই তোমার কিনে দেব মা। এখন শুয়ে পড়ো।

একখানা হুইলের ছিপ।

ছিপ তো রয়েছে।

না। ও দিয়ে ঠিক ধরা যায় না মাছ—

গুচ্ছের মাছ ধরে ধরে এক'দিন কচু বনে ফেলে দিলি। খাবিওনে! মাছগুলো শুধু শুধু মেরে দিয়ে তোর কি সুখ বুঝিনে—

দেবে তো কিনে ? হুইলের ছিপ ?

নিশ্চয়ই। সকাল হোক। শেয়ালদায় শশীকে পাঠিয়ে বৈঠকখানা বাজার থেকে আনিয়ে দেব। শুধু শুধু মাছগুলো কিন্তু মারিসনে মা—।

পালান মিস্ত্রীর ছোটভাই বিলে মিস্ত্রী লাল আলো দেখিয়ে মালগাড়ি থামিয়েছিল। বজ্রেশ্বর নস্করের বিরুদ্ধে তাড়দা ডাকাতি মামলায় পালান কিন্তু রাজসাক্ষী। তবু তার ছোটভাই এখনো বজরার সঙ্গী। বজরার কামাই থেকেই ওদের বাড়ির বাজারহাটের পয়সা যায় এখনো। পালান থাকে শহর কলকাতায়। সন্ধ্যে সন্ধ্যে লুকিয়ে দেশে আসে বিকেলের ট্রেনে। এক স্টেশন আগে নেমে বনবাদাড় ভেঙে বাড়ি আসে। বউ ছেলে মেয়ে দেখে আবার অন্ধকারে বনবাদাড় ভেঙে গিয়ে কলকাতার ট্রেন ধরে। বজরার চোখে পড়লে নিস্তার নেই।

এসব কথা পালানের ছোট ভাইয়ের মুখে শুনেছে বজরা। ছবির

মত পর পর সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। এখন সে বাঁশড়ার বাঁশ বাগানের মুখোমুখি রেলের পাটির বাঁকে। ঝুলন্ত অবস্থায়। নিশুতি রাত। পায়ের নীচে শুখো নদীটার বুক। স্লিপার ধরে ঝুলছে বজরা। নিচে দাঁড়িয়ে রেলপুলিশ এলোপাথাড়ি গুলি চালাচ্ছে। লালবাতি জ্বেলে দিয়ে পালানের ছোটভাইটা সটকানোয় মালগাড়ির ইঞ্জিনের বুকে জোর সাহস। দিব্যি হেডলাইট জ্বালিয়ে বাঁকেরও ওখানটায় ব্রিজের ওপর দিয়ে এই পিছোয়—আবার এই এগোয়। এগোনো পিছোনোর সময় ইঞ্জিনের জ্বলন্ত কয়লা একখানা হাতে পড়লেই হয়েছিল বজরার! দিব্যি বোঁটাছেঁড়া সবেদাটি হয়ে পুলিশের কোলে গিয়ে পড়তো। রেলপুলিশের অর্ডারেই ইঞ্জিন পেছোচ্ছিল। এগোচ্ছিল। জিপগাড়ি নিশ্চয় ততদূর এগোতে পারেনি। নয়তো সেটারও আলো জ্বেলে দিয়ে তাকে খোঁজার চেষ্টা হত। রেল পুলিশের খাতায় যে সে রাইফেলের পয়লা নিশানা—তা বজরা জানে।

কালোকিষ্টে রাত্তির বলেই পুলিশ এখনো তার দেখা পায়নি। ওরা আসার ঠিক আগেই দু'খানা গো-গাড়ি বোঝাই দিয়ে মাল উঠে গেছে ঘাসের মাঠে। কাল দিনের বেলায় যেখানে হাজার মাথা খুঁড়েও রেলপুলিশ আমার মালের হদিশ পাবে না। মোটা পাতির ঘাস আমার বন্ধু। কোন দাগ রাখে না বুকে। বন্ধু এই রেলের স্লিপার। হাত ঘেমে ফোটা ফোঁটায় ঘাম দরদরাচ্ছিল। কব্জির মাঝখান দিয়ে সরু হাড়খানা তার শরীরের ভারে টাটাচ্ছিল। যেকোন মুহূর্তে বজরা এখন খসে পড়তে পারে। কোন পুলিশের গায়ে কিংবা তার নাম দেওয়া সব পাথরের চাঁইয়ে।

বড় চাঁইখানার নাম বজরা তার সেই ছোটবেলায় দিয়েছিলো। গরু চরাতে এসে। ওখানকার ওপর বসে থাকতো। বিকেল হলে ওই পাথরে বসেই সে চরা গরুদের ডাকতো। বাড়ি যাবি চল। নেঃ। এবারে পা গোটা—

তা সে পাথরের নাম বড় খুড়ো। এখন যদি হাত খসে গিয়ে বড় খুড়োর ওপরেও পড়ে—তাহলেও বজরা ছাতু হয়ে যাবে। চোখ বুঁজেও নিস্তার নেই। ভ্রূ ছাপিয়ে বড় ফোঁটায় ঘাম গিয়ে চোখে নেমে পড়েছে। তাতে নুন। বিন বিন করে মন্দ মাছির পাল তার মুখে ছেকে বসছে। বসছে গলায়। শত খানেক হাত নিচেই কালো নদীর বুকে বালিতে দাঁড়িয়ে পুলিশরা সিগারেট ধরালো। একজনের কী হাসির কথায় আরেকজন হেসে গড়িয়ে পড়লো। মাথার ওপর মালগাড়ির ইঞ্জিনটা জলন্ত কয়লা ফেলতে ফেলতে এগুচ্ছে আবার পেছোচ্ছে। এখানটায় রেল পোলখানা একদম ফাঁপা—ইঁটের থাম্বার ওপর কাঠের স্লিপার ফাঁক ফাঁক করে পেতে রেলের পাটি সাজানো।

অন্ধকারে ছিঁটে বৃষ্টি মাখানো হাওয়া। বজরা বোজা চোখে মাথাটা ঝাঁকালো। তাতে মন্দ মাছির ঝাঁকটা উড়েই আবার ফিরে এসে বসলো। রাত্তিরটা এখন সীসের গুলি হয়ে সিধে তার চোখে ঢুকে যাচ্ছে। কোন উপায় নেই। রেলপুলিশের লোক টুক টাক কথা বলছে—আর টর্চের ফোকাস মারছে! সারা গায়ে ভুষো কালি মাখানো বলে বজরাকে খুঁজে পায়নি এখনো। বড়জোর আর কয়েক মিনিট সে এভাবে ঝুলতে পারবে। তার পরেই তাকে পাকা সবেদাটি হয়ে নিচে খসে পড়তে হবে।

মোষ জোড়া এখনো অন্ধকারে মাঠ ভাঙছে। মোটা পাতির ঘাসের ওপর দিয়ে গো-গাড়ি টানতে টানতে ওদের ঠোঁটের কষে ফেনা এসে ভাসবে এবার।

ভগবান এই শেষবার। আর কোনদিন এ-লাইনে আসবো না। এবারটা বাঁচাও। অন্তত এই মাছির হাত থেকে বাঁচাও খানিকক্ষণ। হঠাৎ নিচে কিসের গোলমাল উঠলো।

নিচে তখন নদীর বুকের ওপর দিয়ে হৃদয় নস্কর তার মাচানতলায় যাচ্ছিল। চরের পয়োস্তি জমিতে পটলের মাচানতলা।

পেছনে কোম্পানী বাঁধ অন্ধকার দত্যি হয়ে দাঁড়ানো। চর জমিতে পটল করে হৃদয়। এবারের চেপে আসা বর্ষায় সে ঘুমোতে পারেনি। জল দাঁড়ালে সব পটল যাবে। গোড়াসুদ্ধ পচে যাবে। নালা কাটা আছে। তবু। তবু সাবধানের মার নেই। একদিন অন্তর পনের ষোল কিলো পটল তোলে হৃদয় নস্কর। ঝাঁকা মাথায় দিয়ে কোলে মার্কেটে গিয়ে দিয়ে আসে। ট্রেনে চেপে।

আহা! আঃ! পুলিশ যে মারছে চাপ দেড়েলটাকে।

আমায় মারছো কেনগো। উঃ! এ্যাই ছাখো। মারে আবার —আমি কি করলাম তোমাদের? অ্যাঁ?

ঝুলতে ঝুলতেই বজরা বুঝতে পারলো সব। তখন তার চোখ বুঁজে আসছে। মাথার ওপর স্লিপার আঁকড়ানো হাত তু'খানা এখন জমাট পাথর। মালগাড়ি ভাঙানী ভেবে রেল পুলিশ চাপ দেড়েলটাকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে পিটিয়ে থেঁতো করছে।

বজরার আর কিছু মনে নেই। সে টুপ করে খসে পড়লো।

চার

এসব মাস দেড়েক আগের কথা।

এখন শেষরাতে হিম পড়ে। আশ্বিনের মাঝামাঝি। মাঠ ঘাট সব চাপ চাপ ধানগাছে গম্ভীর—কালচে সবুজ। আজ হৃদয় নস্কর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে। বজরা সকাল থেকেই তৈরী হচ্ছিল। হাসপাতালে দেখতে যাবে হৃদয়কে। মানে, বড়ভাইকে বাড়ি নিয়ে আসবে। রেলপুলিশের ঘাপানী চাপ দেড়েল মানুষটার হাঁটু, কনুই—সব থেঁতো করে দিয়েছে। মহকুমা হাসপাতালে রেলপুলিশই ফেলে দিয়ে যায় হৃদয় নস্করকে।

সেদিন শেষরাতে বড় খুড়োর হাত তিনেক দূরে বজ্রেশ্বরের জ্ঞান ফেরে। তখনো আলো ফোটেনি। পয়লা চরাণীর রাখালরা

বেরিয়ে পড়েছে। চারদিকে ধান। তাই রাখালরা গরু নিয়ে এই শুখো নদীর বুকে আসে। নদীর বুক তো বালি। কিন্তু পাড় বরাবর মোলাম ঘাস। বড়, মেজো, সেঝো, ন'খুড়োদের গায়ের ফাঁকে ফোকরে মাটির পাঁক জমেছে বহুকাল ধরে। সেখানে খাড়া খাড়া সব ঘাস। গাই বাছুর এঁড়েরা দিব্যি খুড়ো মশাইদের গা বেয়ে ঘাসের ডগা জিভের নাগালে নিয়ে আসে।

এরকমই কোন তড়বড়ে গাইয়ের লেজের ঝাপটায় বজ্রেশ্বর নস্করের জ্ঞান ফিরে আসে সেদিন শেষরাতে। তখনো অন্ধকার ছিল। এক একখানা পাথরের চাঁই। এক এক খুড়ো হয় বজরার। তাদের মাথার ওপর দিয়ে নদীর শুখো বুকের থাম্বা বরাবর রেলপোলের নিচেই বাঁকা আকাশখানা অন্ধকারে দলা পাকানো। উঠে যে আলোর আন্দাজ নেবে তার উপায় নেই। সারা শরীরের ভেতর কে তাকে পাথর ভরে লোড করে রেখে গেছে।- এত ব্যথা।

আশপাশে কোন পুলিশ নেই। সেই অন্ধকারেই বজরা বুঝলো, তার বড় ভাই রিদয় নস্কর এখন হরিণবাড়িতে। দাদা তখন এখানে এলো কি করতে? বুঝে উঠতে পারলো না বজরা। আচমকা এসে পড়াতেই না সে আজ বাঁচলো। কী যেন একটা গোলমাল পাকিয়ে গেল। পুলিশরা সিগারেট ফেলে দিয়ে ছুটে গেল। আর মনে নেই বজরার। কখন যে সে খসে পড়েছে—তা টেরও পায়নি বজরা। অত রাতে দাদা কেন এলো এখানে?

আলো ফুটলে বজ্রেশ্বর নস্কর নিজেকে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে বালির ওপর এনে ফেললো। হাঁটুতে চাপরক্ত। বাঁ বুকে রীতিমত ব্যথা। হাড় ভাঙেনি তো! দূরে আলোর ওপর নিড়েনি কাঁধে মানুষজন। কতকাল নদীতে জল নেই। থাকলে বজরা এখন গা ভাসিয়ে দিয়ে কোনো তীরে গিয়ে ভিড়তো। ব্যথায় কামড়ানো শরীরটা তো বইতে হতো না।

বেলা বাড়ার আগেই বজ্রেশ্বর নস্কর বাঁশড়ার বিখ্যাত বাঁশবনের

ছায়া আর আবডালে নিজেকে সরিয়ে নিল। আধো ঘুম আর আধো জাগার ভেতর সে দেখতে পাচ্ছিল, ফাঁকা রেল পোলের ফাটা স্লিপার ধরে খালি গায়ে একটা লোক ঝুলছে। জ্বলন্ত কয়লা ফেলতে ফেলতে মালগাড়ির ইঞ্জিন একবার এগুচ্ছে—আবার পিছিয়ে আসছে। সামনের পেছনের দু'টো সার্চলাইট জ্বালানো। আলো পড়লেই স্লিপারের ছায়া তার মুখে। কোমরের বস্তায় পাইপগান এখন একেবারে পাথরের বন্দুক। এত ওজন লাগছে। আবার আলো পড়তেই নীচ থেকে শিস্ তুলে লোহার পাটিতে ঠোক্কর খেয়ে দুলেই ছিটকে গেল। ও হরি! এর ভেতর দাদা কোত্থেকে এসে হাজির! আমার বড় ভাই তো হাবা বোকাপাঁঠা লোক। সে এলো কোত্থেকে? রিদয় নস্কর এই নিশুতি রাতে? ঠিক এখানটায়

ব্রজেশ্বরের মাথা ঝনঝন করে উঠলো। তার চোখ বুঁজে গিয়ে শরীরটা বাঁশের একখানা শিশু কোড়ের ওপর ঢলে পড়লো। কঞ্চির ডাল বুকে গেঁথে যাচ্ছে। ভাদ্র মাসের ভ্যাপসা গরম মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে সারা শরীরটা সেঁকে দিল বজরার। সারাদিন ধরে। তখনো সে চোখ খুলতে পারছিল না।

এর ভেতর দু'বার বৃষ্টি এসে বজরাকে ভিজিয়ে দিল। বৃষ্টি থামতেই নাছোড় মাছির ঝাঁক। পড়তি বিকেলে মাছিদের সঙ্গে মশারা এসে যোগ দিল। কেঁচো, কেন্নো তার শরীরটাকে এই মাটিরই একটা ঢাল মত জায়গা ভেবে নিয়ে নাক-মুখ-হাতের ওপর দিয়ে দিব্যি সারাদিন ধরে যাতায়াত করলো। চোখে দেখেও ওদের সরাতে পারলো না। মাথার ওপর বোলতার চাক। তারা বেশ পরিশ্রম করে দু'খানা পাকা বাঁশের আড়ায় বাসা বেঁধেছে। আলো কমে আসছিল। বিকেল চারটে তেতাল্লিশের গাড়ি শুখো নদীর ওপরকার ফাঁপা পোল দিব্যি ঝমঝম করে পার হয়ে গেল। ব্রজেশ্বর নস্করের চোখ আবার বুঁজে এলো।

কিন্তু চুনী এসে পড়ে তাকে আর চোখ বুঁজতে দিল না। চুনীর সঙ্গে বজরার জানাশুনো অনেক দিনের। সে দূর থেকে ভুকুভুকু করে তিন চারবার ডাকলো। বজরা পরিষ্কার শুনলো, এখানে এসে পড়লে কি করে?

সে কোন রকমে চোখ তুলে চোখের পাতা দিয়েই ডাকলো, কাছে আয়।

জংশন চন্দনেশ্বরের প্রায় সব মানুষের চোখ দেখলেই চুনী মনটা পড়ে ফেলতে পারে।

ভুগ্ ভুগ্—ভুগ্ভুগ্? (এখানে কি করছো)

কোনরকমে ডান হাতখানা একটু তুললো বজরা। তার কানের পাশ দিয়ে আর পি এফ-এর বুলেট ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে। শিস্ দিয়ে। রেলের পাটিতে লেগে খটাং খটাং।

ভো-আউ-উ—। গলা তুলে ডাকলো চুনী।

বজরা আধোঘুমে জেগে গেল। সে পরিষ্কার শুনলো, সন্ধে নেমে গেলে এখান থেকে তো আর বেরোতে পারবে না।

তারপরই বজরা মরীয়া হয়ে ঘাসের ওপর দিয়ে গড়াতে লাগলো। পিঁপড়ে, কেন্নো, কাঁটাঝোপ। বালি। নদীর বুকে পাথরকুচি। চব্বিশ ঘণ্টা না যেতেই কয়েক জায়গায় পেকে ওঠার বাথা। বজরার শরীরের সেসব জায়গা আবার ছড়ে গেল।

সন্ধ্যে ছ'টা উনত্রিশের গাড়ি স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে গেল। চুনীও বজরাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে ফিরে গেল। এই এতটা পথ সে পাহারা দিয়ে এনেছে বজরাকে। অন্ধকার মাঠের ভেতর একটা খরিশ সাপ একবার রেগে গিয়ে বজরার পিছু নিচ্ছিল। মাথার ওপর আলো ফুরিয়ে যাওয়া আকাশ। দ্বারিকপোতার এ মাঠ চুনীর চেনা। আজই সকালে সে এই মাঠ ভেঙে ওপারে গিয়েছিল। সেখানটায় মানুষজনের ছাওয়া কিছু ঘরবাড়ি—গাছপালা আছে।

আছে দিঘি। আর আছে কয়েকটি অপূর্ব সুন্দর কুকুর.। কালো কুচকুচে গায়ের রং। লাল চোখ।

ভুগ্‌ ভুগ্‌—শব্দ করে ডেকে উঠে চুনী খরিশটাকে তাড়ায় শেষে। নয়তো বজরার পায়ে নির্ঘাৎ দংশাতো। বজরা তখন আলে আলে গড়াচ্ছে। গড়াতে গড়াতে নস্করদের বাপকেলে ভিটেয় ফিরে যাচ্ছিল। মাঠ তো ধানে বোঝাই। কালচে সবুজ। তাদের গোড়ায় পাগলা বর্ষার জল। এই ঝেঁপে আসে। আবার শুকনো খটখটে।

হামা টেনে টেনে বজরা যখন বাড়ির উঠোনে ঢুকলো—তখন সনকা বারান্দার ওপর থেকে লাফিয়ে উঠোনে পড়লো। কথাগুলো কান্না হয়ে গেল। এ কি দশা গো তোমার! এ সব্বোনাশ কে করলো তোমার?

বজরা দাঁতে দাঁত চেপে বললো, পুলিশ এসেছিল?

হুঁ। আজ দুপুরে—। দাদাও কালরাতে বেইরে আর্‌্য ফেরেনি। আমরা দু দু'টো মেয়েমানুষ মোটে—

চুপ কর। গরম জল করতি পারবি? এট্টু নুন দিস তাতে।

অনেক রাতে টেমির আলোয় দু'জন মেয়েলোক মিলে বজরাকে সেঁক দিচ্ছিল। বজরার গায়ে তখন ধুমজ্বর। তার ভেতরেই সে তার বড়ভাইয়ের বউকে ধমকে উঠলো। কাঁদছিস কেন? চুপ।

কান্না গিলে ধরা কান্নায় হৃদয় নস্করের বউ বললো, কাল রাত্তিরে পটল ক্ষেতে গেল। আর ফিরলো নি মানুষটা। কোথায় গেল? মরে যায়নি তো তোমার দাদা—

না। পুলিশে ধরে নে গেছে।

এরপর বজরা আর সাতদিন কোন কথা বলতে পারে নি। বড় ভাইপোটা একদিন সকালে তারই পায়ের কাছে চেঁচিয়ে উঠলো। খই ভাজা খাবি? এই খুড়ো?

তখন সকালবেলা। বছর আটেকের ভাইপোটা লাফালাফি

জুড়ে দিয়েছে। ঘুম থে উঠে দেখি—এই অ্যাত বড় সব কই মাছ বুকে হাঁটে। আমাদের খিড়কির পুকুরটা ভেসে গেল তো।

বজরা হুড়মুড় করে উঠতে যাচ্ছিল। আশি টাকার মাছ ছাড়া আছে। সেগুলো বড়ও হয়েছে। বেরিয়ে গেল বোধহয়। দাদাটাকে দিয়ে তো কোন কাজের কাজ হবে না। সারা শরীরে কোথাও জোর নেই। সে আস্তে বললো, তোর বাপ কোথায় রে?

তিনি তো হাসপাতালে—।

একদম শিশু। যা শোনে তাই বলে। বাপের সরল-সিধেমী পেয়েছে।

বড়ভাইপো'টা তেমনি কলকল করে বলে উঠলো, তোমার মত ডাকাতি করতি গে প্যাদানী খেয়েছে—

কথা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বজরা বললো, তোর বাপ বলেছিলো, বাঁশ চিরে চিরে পুকুরের চাদ্দিকে লাগিয়ে দেবে। দিয়েছে?

আসলে বজরা বড়ভাইয়ের হাতে টাকা দিয়ে রেখেছিল। সময়মত পছন্দসই বাঁশ কিনে পুকুরের চারধারে খেঁতো করে বসিয়ে দেবে। তাহলে পুকুর ভাসলেও মাছ বেরোতে পারবে না। তা আর করা হয়নি নিশ্চয়। বজরা নিজেও দেখার সময় পায়না কোনদিন।

তোমার তো বড় ভাই। তুমি গে বলো না—

বড় ভাইপোটার বুদ্ধি হয়েছে তো বেশ। বাপের ধারা সরল। কিন্তু সেই সঙ্গে এই আট বছরের খোকাটিকে বজরার বড় সুন্দর লাগলো।

সেদিনই দুপুরবেলা বজরা টাটকা কইয়ের ঝোল দিয়ে ভাত খেল প্রথম। খেয়ে দেয়ে ঘুম এলো না। একটু একটু করে তার সব মনে পড়তে লাগলো। সনেকার মুখ ঝুলে আর তার চোখের সামনে পাশে দুগ্‌গা ফারমেসির ললিত কম্পাউণ্ডারবাবু। হাতে

ছুঁচ। বউদিদি কলাই বাসনে সাবু জ্বাল দিয়ে ঠাণ্ডা করছে তালপাখায়। তোলা দুধে মিশিয়ে খেতে দেবে বজরাকে।

বেলা না বাড়তেই সনকা আর তার বড়জা বেরোবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। বজরা তার বউকে বললো, দাদা এখন কেমন?

চোখ মেলেছে। খুব দুর্বল। এমন করে মানুষে মানুষকে মারে।

দাদার জন্যি আমি বেঁচে আছি।

সনকা এগিয়ে এসে বললো, তা আমি বুঝিছি। তোমারে ভেবেই তো দাদার উপর অত পিটুনী। এত নরম হাড়ে অত সয়?

আমি তোমাদের সঙ্গে হাসপাতালে যাবো।

এখন না। দু'জনে দু'দিকে সেরে ওঠো। তারপর তো দেখা হবেই।

বজরা অনেক আগেই সেরে উঠলো। সময় লাগলো রিদয় নস্করের। বন্দুকের বাটে থ্যাতলানো হাত পা ভেতরে ভেতরে চুরচুর অবস্থা। সেগুলো জোড়াতাড়া দিয়ে ঠিকঠাক করতেই সময় চলে যাচ্ছিল। তবু কি সারে!

বজরার সেরে উঠতে ভাদ্রমাস কাবার। সে গুটি গুটি এদিক ওদিক যাওয়া-আসা শুরু করে দিল। বড় ভাই হাসপাতালে বউদিদির যাদবপুর গিয়ে ঝি-গিরি করা বন্ধ। সংসার চলে পুকুর-ধারের ওল তুলে। ওল ভাতে। ওলের ডালনা। চানাচুনো দিয়ে কচুর লতির চচ্চড়ি।

বজরা দুপুরে হাঁটতে হাঁটতে পালান মিস্ত্রীর বাড়ি গেল। পালান তো তাড়দা মামলার রাজসাক্ষী। ওর ছোটভাইটা বজরার সঙ্গ ছাড়েনি। তাকে খুঁজে বের করলো। রেল লাইনের গায়ে পালানদের বাড়ি। ট্রেন চলে গেলে নির্জন। পালানের ভাই বিলে মিস্ত্রী বজরার সঙ্গে কথাই বলতে চায় না। কি কাজ আছে— কলকাতায় যাবে।

মালপত্তর কোথায় ?

সেসব তো ধরা পড়ে গেল। পুলিশের হেফাজতে।

বজরা আগের মতই দাঁতে দাঁত ঘষে বললো, কোন মাল ফসকায়নি। চিনি ছিল বারো বস্তা। তাছাড়া—

আমি আর ওসবে নেই। পুলিশ তিষ্ঠোতে দেয় না।

বজরা অন্য কথায় একদম গেল না। পরিষ্কার বললো, একজনও ধরা পড়োনি। এক বস্তাও মাল ফসকায়নি। আমি সব জানি। আমার বড় ভাইয়ের জন্যি আমরা সবাই বেঁচে আছি, নয়তো—

ব্যাপারটা পালানের ছোটভাইও জানে। কিন্তু তার এখন কোন সত্যি কথা স্বীকারের উপায় নেই।

এক্ষুনি দেড়শোটা টাকা দে বিলে। আমার খুব দরকার।

বিলে বললো, অত টাকা কোথায় পাবো এখন ?

ওসব আমি জানিনে। বাড়ির দু'দুটো পুরুষ বিছানায় শুয়ে। সংসার অচল। যারা চিনির বস্তা কিনিছে—তারাই বলে দিল কত টাকায় গস্ত করিছিস মাল।

বিলে পকেট থেকে তিরিশটা টাকা বের করে দিয়ে বললো, জ্বালাস নে—

তিরিশ টাকায় আমার কিছু হবে না। তোরা ভেবেছিলি—এবারের মত বজ্রেশ্বর নস্কর পটল তুললো। তাই না ?

বিলে ওরা তাই-ই ভেবেছিল। নয়তো সব মাল গস্ত করে দিয়ে টাকার ভাগাভাগি তো এত তাড়াতাড়ি হয়ে যায় না অন্যবারে। আরও তিরিশ টাকা দিল বজরাকে।

টাকাটা হাতে নিয়েই বজরা ঘুরে দাঁড়ালো। আজকের মত এই নিলাম। আবার আসবো।

শরীরটায় তেজ নেই বজরার। নিজের দলটা টাকার ঝুমঝুমি হাতে পেয়ে ভেঙে তছনচ। বড়ভাইটা এখনো হাসপাতাল থেকে বেরোতে পারল না। পালান মিস্ত্রী রাজসাক্ষী হওয়ার পর বদল

নেওয়া এখনো বাকি। আশ্বিনের শুরুতেওএ আকাশা একদম ভাজা ভাজা। বজ্রেশ্বর নস্করের মনের ভেতর এই কথাটা ডিগবাজি খেতে লাগলো—আমি কি পারবো? আমি কি সত্যিই পারবো?

আসলে সে তখনো জানে না—কী সে পারবে? কোন্ জিনিসটা? জীবনের এক এক জায়গা দিয়ে আবার জীবন শুরু হয়ে যায়। মানে জীবন থেকে একটা জীবন বেরিয়ে আসে।

বিকেলের দিকে সনকা আর তার জা যখন মহকুমা হাসপাতালের পথে বাসে—তখন বজ্রেশ্বর নস্কর পুরনো অভ্যেসে সেখানে গিয়ে হাজির হোল। এরই জন্যে সে সনকাকে দেওয়া গয়না কেড়ে নিতে গিয়েছিল।

জায়গাটা জংশন চন্দনেশ্বরের একটেরে। সামনে দিয়ে পৃথিবীর ওপর কয়েকটা রাস্তা বয়ে গেছে। রাস্তাগুলোর মাঝে নিচু জায়গায় কালচে সবুজ ধানগাছের জমায়েত। কলকাতার ময়দানে ঠিক এই ভাবে গাদাগাদি করে মিটিং হয়। বজরা দেখেনি। শুনেছে।

চেষ্টা করেও নাম মনে করতে পারলো না বজরা। এ ঘর তারই বানানো। এ মেয়েছেলে তারই এনে বসানো। খারাপ খারাপ ওষুধ গিলতে হয়েছে। জ্ঞান ছিল না অনেকদিন। তারপর দুগ্‌গা ফার্মেসীর ইঞ্জেকসন। সে অনেক কষ্টে বলে উঠলো, তুমি য্যানো কে?

মেয়েলোকটি শক্ত পাথর হয়ে দাঁড়ানো। গায়ের চামড়া কালচে—কিন্তু ডলে দিলে ঠিক লাল হয়ে যাবে। এরকমই একটা কথা বজ্রেশ্বরের মনে পড়লো। তবু কিছুতেই মেয়েলোকটির নাম মনে পড়লো না বজ্রেশ্বরের। অথচ সে চেনে একে। তাই আবার বললো, তুমি য্যানো কে গো?

ঝামরে উঠে মেয়েলোকটি বললো, আমি তোমার ভাগানো পীরিত।

এরপর আর রসিকতার পাতলা আড়াল থাকলো না। সে

দিব্যি বজরাকে কান ধরে টেনে বারান্দায় তুললো। এই তোমার বানানো ঘর। মাটির বারান্দা। ওই গ্যাখো মাথার ওপর ভাঙা টালি আর তাল পাতা। স্বামীর ঘর থেকে পথে নামিয়ে এখানে এনে তুলেছিলে তুমি—! মনে পড়ে?

একটু একটু।

চটাং করে এক চড় কষালো বজরাকে। এ' কদিন কি খেয়ে আছি—একবার খবর নে দেখেছো? ছিলে ডাকাত। হলে পাগল!

বজ্রেশ্বরের মুখ ফসকে একদম অন্য কথা বেরিয়ে এলো। যদি জানতিস—কী হয়েছিল আমার। মরে যাচ্ছিলাম। একদম মরে যাচ্ছিলাম।

সে আবার নতুন কিসির? ডাকাতিতে তো লোক মরেই।

খানিকক্ষণ কোন কথা নেই। এখন জংশন চন্দনেশ্বরের আশপাশের মাঠঘাট চুপচাপ। ধানগাছ বিয়েন কাঠি ছাড়ছে। কোন থামা নেই। দিনরাত। লোকজনের কাজ নেই। বিকেলের আলো থাকতে থাকতে সবাই রেল বাজারে গপ্পগাছা করতে গেছে। সন্ধ্যে রাতে কেরোসিনের শিশি হাতে সবাই গপ্প করতে করতে ফেরে। তার আগে এদিককার সারা দেশ খানিকক্ষণ খা খা করে।

বজরা নিজের গলা শুনেই অবাক হয়ে গেল। সে তখন বলছিল, আমায় মেরোনি। আমি বড় দুব্বল।

আমায় ভাগিয়ে আনার সময় সে কথা তো ছিল না। আমি এখন খাবো কি? সে পুরুষ লোকটা তো দু'বেলা খেতি দিতো। তার তো কোন দোষ ছিল না।

বজ্রেশ্বর শান্ত গলায় বললো, ফিরে যাও তার কাছে। সে ক্ষমা করে দেবে। হাজার হোক তুমি তা তার বে-করা বউ।

তা দেবে। বড় ভালবাসতো আমায়। আমিই বাসিনি তারে—

আজকের বিকেলটার আলোর ভেতরে, বাতাসের ভেতরে এমন

এমন চোরাপথ ছিল—যা দিয়ে মনের খুব সোজা কথা সোজা হয়ে বেরিয়ে আসতে পারছিল। কোন রকমের ঘোট না পাকিয়েই।

এই পৃথিবীর মানুষজন সবাই আলাদা আলাদা। সেকথা বোঝার জন্যে মেয়েমানুষটি কিংবা বজ্রেশ্বর নস্কর—কারও আলাদা করে কোনো বিদ্যা শিক্ষার দরকার পড়লো না। এই মাটির কুঁজিঘর আর তার আশপাশে পৃথিবী তার পরিমাণ মত অল্প গাঢ় একখানা সন্ধ্যা পাঠিয়ে দিলো। তার ভেতর বজরার মনে পড়লো, আমি তো মরে যাচ্ছিলাম।

মেয়ে মানুষটির মনে পড়লো, চাল যা আছে—তাতে কালকের দিনটি চলবে। তারপর? পুরুষের সোহাগ! সে তো জোনাকির আলো।

আশ্বিনে সব দিঘি কানায় কানায়। নাতু শী-র পুকুর রাস্তা থেকে দেখা যায় না। বর্ষার গোড়ায় কাঁটাওয়ালা এক রকমের ডাল কেটে বসিয়ে দিলেই আশ্বিনে তারা পাতা ছাড়ে—আর তার আগেই শেকড় ছাড়া সারা।

রাধিকা হুইল ঘুরিয়ে নাইলন সুতো গুটিয়ে ফাৎনা ফেলছিল। পছন্দসই জায়গায়। শশী পাকড়াশি মাছের চার মাখছিল। কিন্তু মাছের কোন দেখা নেই। এইসময় চড়া রোদ থেকে বড় মাছদের বাঁচাতে মাঝ দিঘিতে বাঁশের মাচায় নারকেল ডাল কেটে বিছিয়ে দেওয়া হয়। তার ছায়ায় মাছেরা খেলে।

দামী চারের গন্ধে মাছেরা যাও-বা আসছিল—রাধিকার এলোপাথাড়ি শিকারে একটা কাতলার বাচ্চা বঁড়শী গেঁথেও ফসকে গেল। সে পাতালে গিয়ে খবর দিল, ওদিকে যাসনে। একটা খুনী মেয়েছেলে হুইলের ছিপ নে বসেছে।

নাতু গেছে কলকাতায়। স'বারোটার ট্রেনে। সে নিজেও একটি পাত্রের খবর পেয়েছে। একটু দেখাশুনো করে আসবে।

রাধিকার এখন পাঁচ মাস। সে আটটি চারা পোনা ধরে গরম ঘাটলায় ফেলে ফেলে মেরেছে। তাদের মড়ায় এখন কালো ডাই পিঁপড়ের ঘোরাঘুরি।

শশী বললো, এবার দিদি ভেতরে গে বিশ্রাম করো। রোদে মাথা ঘুরবে এরপর।

যা করতে বলেছি করো। চারটা ভালো করে মাখোতো। আমি মাছেদের ছাদনাতলায় যাবো।

শশী পাকড়াশি এরকম একটি মেয়ে পেলে এবারের পালায় এমন রিহার্সেল দিয়ে নামাতো যে পাবলিকের তাক লেগে যেতো। কিন্তু রাধিকা দিদি তো আর যাত্রায় প্লে করবে না। এ হোল গিয়ে পয়সাওয়ালা বাপের মেয়ে। হোক না বেধবা। কুমারীর চেয়েও বেশী আদর।

শশী এ ক'দিন চার মেখে মেখে বুঝেছে—মানুষে মানুষে ফারাক আছে। তাদের ঘরের এইটুকু মেয়ে তার বয়সী পুরুষমানুষকে এমন চাকর বাকরের মত ধমকে কাজ করাতে পারতো না। সে যতো দিদি বলে ডাকে—রাধিকা তাকে ডাকে শুধু শশী বলে। একবারের জন্যেও দাদা কথাটা মুখে আসে না। পরন্তু তাকে দিয়ে একটা গাবগাছ থেকে নালশে পিঁপড়ের বাসা ভাঙিয়ে এনেছে। পিঁপড়ের ডিমের চেয়ে সেরা চার আর কি হতে পারে! আরেকটু হলে ভিজে গাছের গা থেকে শশী পা হড়কে পড়ে যেতো।

সে খুব আত্মীয়তা মাখানো গলায় বললো, এর ভেতর ছাদনাতলা দেখলে কোথায় দিদি!

কেন? ওই যে—ওখানে বসে ছিপ ফেলবো।

শশী সাবধান হয়ে গেল। ওখানটায় মাছগুলো ছায়ার লোভে ভিড় করে। কিন্তু ওখানে যাবে কি করে মেয়েটা? চপ করেই ছিল শশী।

রাধিকার হুকুম হোল, কলাগাছ কাটো। মোটা দেখে। ভেলায় করে যাবো।

না গেলেই না দিদি? ওই তো অতগুলো মাছ মেরেছো।

ওগুলো তো আমাদের বেড়ালগুলোর জন্যে রাঁধবো এবেলা। জানো শশী—চন্দনেশ্বরের বেড়ালের বেশ সোয়াদ আছে। সর্ষে বাটা দিয়ে রাঁধলে তারিয়ে তারিয়ে খায়।

তুমি কি এখন রাঁধতে বসবে দিদি?

হ্যাঁ। নয়তো তুমি ভেলা বানাবার সময় পাবে কি করে?

এখুনি বানাতে হবে?

নয়তো কখন শশী!

বড্ড বেয়াড়া মেয়ে। একথা মনে মনে বলে দা-এর খোঁজে শশী ভেতরবাড়ি গেল। মেয়ের মা তো কিছু বলতে পারে মেয়েটাকে: এই কি কচি বেধবার শোকের চেহারা!

কলাগাছ আর বাঁশ কেটে ভেলা ভাসাতে শশী পাকড়াশির তিন তিনটে লোক আর তিনটি ঘণ্টা গেল। ভেলা ভাসবে। আর তা নিরাপদও হওয়া চাই।

বেলা স'তিনটেয় রাধিকা ভেলায় ভাসলো। সঙ্গে ছিপ আর সুগন্ধী চার। ভাজা মেথির গন্ধে পুকুর ঘাটলায় তিন চারটে বোলতা উড়ে এলো। তখন মাথার ওপর একখানা মেঘ এসে পড়ে জায়গাটায় ছায়া দিল।

হাত দিয়ে জল কেটে সে মাছেদের ছাদনাতলায় পৌঁছে গেল। তারপর পয়লাবারেই ফাৎনা ভাসিয়েই একটা বড় মাছ গেঁথে ফেললো। কিন্তু মাছটা নির্ঘাৎ মৃগেল। সে গাঁথা-বঁড়শী ঠোঁটে নিয়ে একদম পাতালের পাঁকে মুখ গুমড়ে শুয়ে পড়লো। কালচে জলের ভেতরটা খানিক জায়গা জুড়ে লাল হয়ে যাচ্ছিল। আড় বঁড়শীর উল্টো কাঁটায় ঠোঁট ফাল হয়ে রক্ত ঝরে যাচ্ছিল মৃগেলের।

ভাসা ভেলা থেকে রাধিকা আদেশ দিল। ও শশী। এবারে

জলে নেমে মাছটাকে তাড়াও। নয়তো ও তো আর কোনোদিন পাঁক থেকে উঠবে না।

আশ্বিনের বিকেল। ভ্যাপসা গরম। সারাদিনের রোদ খাওয়া জলও গরম। নামার ইচ্ছে ছিল না শশীর। সে বললো, মাছ তো খাবে না। ছেড়ে দাওনা মৃগেলটাকে। তোমার পেটের ছেলে ভূমিষ্ঠ হোক। অন্নপ্রাশন যখন হবে—তখন না হয় ধরে দেবো ওকে—

এ কথায় রাধিকা চোখ ফিরিয়ে তাকালো। যার মানে—বড় বাড় বেড়েছো তো শশী। এক্ষুনি জলে নামো বলছি—

শশী প্যাকড়াশি ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়লো।

এই রাধিকার জন্যে পাত্তর খুঁজতে বেরিয়েছে অনন্ত বাঁড়ুজ্যে। ভোর ভোর রওনা করিয়ে দিয়েছে সরোজপ্রভা। নাদু শী-র এক কথা। বাঁড়ুজ্যে মশাই। তেমন পাত্তর যদি খুঁজে বের করতে পারেন—তো আমি আপনার বসত ভিটে, জোতজমি, পুকুর—সব কিছুর কোবালা ফেরৎ দিয়ে দেব। একটি পয়সাও আমার চাইনে। আমার রাধিকের ভাল হলিই সব ভাল।

এর ভেতর দফায় দফায় আরও একশো ত্রিশ টাকা নাদুর কাছ থেকে নিয়েছে অনন্ত। সেই একই সুবাদে। রাধিকাকে কষ্ট দেবে না। তার পেটের বাচ্চাটিকে আদরে রাখবে। রাধিকা সুখী হবে। ছেলের ঘরবাড়ি থাকা চাই। চেহারাটি মোটামুটি হলেও চলবে। শাউড়ি যেন কষ্ট না দেয় রাধিকাকে। আবার গা ভরে গহনা দেবে নাদু।

ইদানীং সরোজপ্রভার তাড়াতেই পাত্তর দেখতে বেরোয় অনন্ত। কয়েক হাজার টাকার দেনা সুমসাম হয়ে যাবে—যদি ভাল পাত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। এটা একটা মস্ত সুযোগ। আহা! কচি মেয়েটা।

বেলা চারটেয় নাদুর পুকুরে যখন শশী ঝাঁপ দিল, ঠিক তখন—

অনন্ত বাঁড়ুজ্যে বড় একখানা মাঠ ভেঙে নবাসনে পৌঁছালো। এদিককার গাছপালাগুলো বড়। গাই বাছুরগুলো তিজি। ছনে ছাওয়া ছাদের আড়াগুলো উঁচু উঁচু। আসলে নবাসনের মানুষ-গুলোও একটু বেশি লম্বা। গাছের পাতা কালো সবুজ। আল ধরে ধরে মাঠটা পার হয়েছে অনন্ত বাঁড়ুজ্যে। দু'পাশের ধানে কোথাও কোন রকম পোকা লাগেনি।

পাকা খবর পেয়েই অনন্তর এই নবাসন যাত্রা। ভালো জাতের আমগাছ ছায়া ছড়িয়ে ছড়িয়ে দাঁড়ানো। তাদের গোড়ায় গেরস্থদের হলুদ আর আদার চাষ। একটা দুধে বাছুর তিড়িং তিড়িং লাফাচ্ছিল। রাখালী ছোকরা মত একজনকে দেখে অনন্ত ডাকলো, ইদিকে জ্ঞানো বাবুর বাড়ী কোনটে?

ছোকরা হাত তুলে দেখালো। অনন্ত বাঁশের বেড়ায় গিয়ে দাঁড়ালো। সাজানো গোছানো তকতকে ঘরবাড়ি। স্বাস্থ্যবান এক গেরস্থ। মাথাটি কিন্তু শাদা। বেরিয়ে এলো।

আমি অনন্ত বাঁড়ুজ্যে। চন্দনেশ্বরের দক্ষিণ পাড়া থেকে আসছি। আপনি তো জ্ঞানো বাবু?

হু। কি ব্যাপার? আমায় তো কেউ বাবু কয় না—

আগে একটু বসতে দিন। আমি বড় ক্ষুধার্ত। এই বড় মাঠখানা ভেঙে এলাম।

কেন? বাস ছিল না?

বাসের রাস্তা তো আমি চিনিনে।

বসেন। বসেন। এখানটায় বসেন। কি ব্যাপার তা তো জানলাম না—

আপনার তো একটি পুত্র আছে—

আমার পাঁচটি ছেলে।

ওই হোল। বড়টি বিবাহযোগ্য।

তা কেন? প্রথম তিনটিই বিবাহযোগ্য।

বড়জন তো দফতরে যায় ?

হু। এই তিন বছর খাতা লিখছে। মহকুমা রেজিষ্টারি অফিসে। বাকি চার ছেলে আমার সঙ্গে হাল দেয়। আপনি বসুন।

অনেকদিন পরে একটা জায়গা দেখে অনন্তর ভালো লাগলো। নবাসন খুব পুরনো জায়গা। কেননা, বটতলার ছায়ায় একটা মন্দির চোখে পড়েছে আসার পথে। তবে এই ছনে ছাওয়া ক'ঘরের বসতি একদম নতুন। বছর পনেরো আগে সরকার থেকে জমি বিলি হয়েছিল। এখানকার জীবনে কোন বন্ধকী কারবার হয়তো নেই। রেল স্টেশন সেই কতদূর। ইলেকট্রিক আলো কোনদিনই এখানে পৌঁছাবে না। রাধিকা কি এমন জায়গায় এসে থাকতে পারবে ?

সন্ধ্যেবেলা হাত পা ধুয়ে গাছের আম আর গাইয়ের দুধ দিয়ে অনন্ত ফলার সারলো। খেতে খেতেই সে রাধিকার বাবার অবস্থার একটা পিকচার দিচ্ছিল। বাড়ি, বন্ধকী কারবার, রেলবাজারের গদী আর বাজারের অংশ সব মিলিয়ে সে একেবারে কুবেরের ধন। ওখানে যদি ছেলের বে দেওয়া যায়—তাহলে শুধু শুধু আর মহকুমা রেজিষ্টার অফিসে গে খাতা লেখা কেন ? শ্বশুরও তো এক ধরনের বাপ। কিছুকাল পরে ছেলেকে গিয়ে বন্ধকীর গদিতে বসতে হবে। হ্যাঁ। শালাবাবু আছেন একজন। সে ছেলেমানুষ। উড়োনচণ্ডী গোছের। বাস নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

ছেলের বাপ সন্ধ্যার অন্ধকারে অনন্ত বাঁড়ুজ্যের আঁকা স্বচ্ছল ছবিখানা দেখতে পাচ্ছিল। নবাসনে এই ঘরবাড়ি, গাছপালা, পুকুর, জমি জিরেত তাকে একটু একটু করে করতে হয়েছে। হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেছে জ্ঞানো। তখন তো পাঁচ ছেলেই ছোট। ওদের গর্ভধারিণী এই গাছপালা দেখে যেতে পারেনি। সেকথাই তুললো জ্ঞানো বাবু। ছেলেগুলো মা মরা—

অনন্ত বাঁড়ুজ্যে আজকাল আর পরের গপ্প শুনতে পারে না।

অধৈর্য হয়ে পড়ে। সব মানুষেরই তো একটা দু'টো করে গল্প থাকে। সেসব গল্প ডালপালায় ছড়িয়ে পড়লে—সে লক্ষ্য করেছে—তার এই জীবনতলায় অন্ধকার করে ছায়া নামে। তখন আর সে সবকিছু সাজিয়ে গুছিয়ে সিজিলমিছিল করে মনে করতে পারে না। আসলে গল্পগাছায় ভরপুর এ-দুনিয়ায় তখন তার স্মৃতি ফেল করে।

তবু অনন্ত জ্ঞানোবাবুর গল্পটি শুনতে লাগলো। আর শুনতে শুনতে লক্ষ্য করলো, সে আসলে কিছুই শুনছে না। চোখের সামনে তার একখানাই ছবি শুধু। সে-ছবি হোল—নাদু নিজে দাঁড়িয়ে অনন্তকে তার জমি জায়গা ঘরবাড়ির বন্ধকী দলিলখানা দিয়ে দিচ্ছে।

এরই ভেতর অনন্ত ফট করে বলে বসলো, পাত্রী কিন্তু বেধবা—

একথা তো আগেই বলবেন—

একদম কচি বেধবা। ষোল বছরও বয়স হয়নি রাধিকের। বিষয় সম্পত্তির কথাটাও ভাবুন একবার—

জ্ঞানো কি বলতে গিয়ে চুপ করে গেল।

অনন্ত তখন বলছিল, আর এখুনি তো বে হচ্ছে না। বে মানে সাত খানা কথা হবে। তারপর তো।

আসলে অনন্ত সময় চায়। কারণ রাধিকার যা অবস্থা—তাতে রাধিকারই সময় লাগবে। মেয়ে বিয়োতে পারে রাধিকা। ছেলেও হতে পারে। আবার জন্মেই মরতে পারে। কিংবা মরাও বিয়োতে পারে। আবার বলা যায় না—কাঁচাও যেতে পারে। শুধু শুধু পাত্রী যে এখন পোয়াতি—সেকথা বলে লাভ কি।

আসলে জ্ঞানো বাবু—পাত্রী বে হবার পরেপর বেধবা। সামনে ভরা জীবন। এ আজকাল আর বসে বসে চোখে দেখা যায় না। ভালো ছেলের সঙ্গেই বে হয়েছিল। অপঘাতে মারা গেল—

কি হয়েছিল ?

জলে ডুবে।

বাড়ির ভেতর থেকে একটি ছেলে বেরিয়ে এসে বললো, আসুন। খেতে বসবেন। জায়গা দিয়েছে।

টাইমটেবল ধরে ধরে ট্রেনগুলো ঠিক যায় আসে। জংশন চন্দনেশ্বরের ওপর সারাদিনে কম চাপ যায় না। আটকামরা বোঝাই দিয়ে লোহার গাড়ি এসে দাঁড়ায়। মাল খালাস করে বেরিয়ে যায়। এসব হপ্তা খানেক আগের কথা। এখন শেষরাতে হিম পড়ে। আশ্বিনের মাঝামাঝি। মাঠ ঘাট সব চাপ চাপ ধান গাছে গম্ভীর—কালচে সবুজ। আজ হৃদয় নস্কর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে। বজরা সকাল থেকেই তৈরি হচ্ছিল। হাসপাতালে দেখতে যাবে হৃদয়কে। মানে বড় ভাইকে বাড়ি নিয়ে আসবে।

পাঁচমাইল দূরে মহকুমা হাসপাতালে গিয়ে বজরা নামতেই বাসস্টপের রাধাচূড়ো গাছ থেকে একটা লেজঝোলা বড় পাখি দোল খেয়ে পাশের গির্জের ক্রসে গিয়ে বসলো। রুগী, রুগীর আত্মীয় স্বজন—সবাই যারা হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়েছিল—তারা চোখ তুলে এই অচেনা পাখিটাকে দেখতে লাগলো। এমন পাখি তো শহর-গঞ্জে আসে না। এ তো গভীর জঙ্গলের জিনিস।

ছাড়া পেয়ে হৃদয় নস্কর বারান্দায় বসে ছিল। এসেছিস—আয়। আমি কিন্তু বাসে যেতি পারবো না।

সাইকেল রিকসো।

পা টান করে বসা যাবে না বজরা—।

তাহলে সাইকেল-ভ্যান ডাকি। পা ছড়িয়ে বসবে'খন।

পড়ে যাবো না তো ?

আমি তোমায় ধরে বসে থাকবো।

তাই হোল। খানিকবাদে দেখা গেল পিচরাস্তার ঝাঁকুনি বাঁচিয়ে একখানা সাইকেল-ভ্যান বেশ টাল সামলে চলেছে। তাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা এক চাপদেড়েল। পাশে কটা চোখে আরেকজন।

চলন্ত ভ্যানে বসে প্রথম কথাই হৃদয় পাড়লো পটল নিয়ে। জল বসা হয়ে পটলগুলো পচে গেল নিশ্চয়।

প্রাণে তো বেঁচেছো—এই যথেষ্ট।

একদিন অন্তর একদিন পটল না তুললি গাছের তো দফা নিকেশ।

তুমি নিজি নিকেশ হয়ে যাচ্ছিলে বড়দা! সে খেয়াল আছে?

তারপর এই দেড়মাস জুড়ে বিষ্টির জল বসা গেল। অত খাটুনি সব জলে গেল বজরা।

যেতি দাও তো।

দিশি পটল এখন শেয়ালদায় আড়াই টাকা কেজি।

পাঁচ সিকে আড়াই টাকার গপ্প এবার ছাড়ো তো বড়দা।

কেন ছাড়বো। এ আমার নিজির খাটুনির পয়সা।

সে সবাই খাটে। রোজগারের জন্যি কে না খাটে।

আমার খাটুনী তোর চে আলাদা জাতের বজরা। আরেকটু হলি তোর জন্যি আমি মরে যাচ্ছিলাম।

বজরা চুপ করে গেল। দু'ধারে পিচ রাস্তার গায়ে মাটির ঘর-বাড়ি। আবার পাকাবাড়ি। দোকান ঘর। মুদীখানা। পাতিহাঁস জোট বেঁধে পুকুরে। দু'ধারে গাছের মাথা নুয়ে পড়ায় পিচরাস্তায় শুধু জালি কাটা রোদ।

পাঁচ

জংশন চন্দনেশ্বরের রেলবাজারের গা ধরে এখন শুধু গো-গাড়ির ভিড়। কার্তিকরাঙী ধান বাজারে উঠে বিক্রিবাটা সারা। এখন পৌষধানের বোঝা ঝুমঝুমি বাজিয়ে পিচরাস্তা পেরোয়। গাড়ির গরুগুলোর চোখ ছায়ামাখানো। গেরস্থকে লুকিয়ে চুরিয়ে

পাকা ধান খাওয়ার দরুন বেশীর ভাগ গরু এখন পেটের ধাত ছেড়ে দিয়ে বসে আছে।

বাতাসে রসের গন্ধ। শিউলিরা পাছা অব্দি কাপড় তুলে বাঁক কাঁধে এ মাঠ সে মাঠ করে বেড়াচ্ছে। কোমরে কাছি আর দা। নাড়ু শী বারান্দায় বসে ধান ঝাড়া দেখছিল। সামনে পুকুরের ওপারেই পিচরাস্তা। সেখানে মেকানিক নিয়ে জগন্নাথ তার সরকার টুরিস্ট সারভিসের নতুন রং করানো বাসখানায় ফাইনাল টাচ দিচ্ছিল। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে অনন্ত বাঁড়ুজ্যে ঢুকলো। হাঁটু অব্দি ধুলো। বগলে ছাতা।

নাড়ু হাত তুলে ধান ঝাড়ানো বন্ধ করতে বললো। ও শব্দে কোন কথা শোনা যায় না। আমি আর টাকা দিতে পারবো না বাঁড়ুজ্যে মশাই। অনেক তো পাত্তর দেখলেন। কোনটাই ফাইনাল হয় না।

টাকা চাইনে নাড়ু। তুমি একবার ছেলেটিকে দেখে এসো। সচ্চরিত্র, স্বাস্থ্যবান, পরিশ্রমী।

কি করে?

চাষ করে নাড়ু।

হাসালেন আপনি। আমার মেয়ে হেলে চাষার সঙ্গে গিয়ে থাকতে পারবে? সেই যে খাতা লেখে একটি ছেলের খোঁজ এনেছিলেন। নবাসনের। তার খবর কি?

বয়সের ফারাকটা বড্ড বেশী হয়ে যায় ওখানে। তুমি নাড়ু এ-ছেলেটিকে ছাখো। চাষবাস ক'রে নিজের অবস্থা ফিরিয়েছে। আগে সরকারী খালের মাটি কাটতো। এখন বিঘে সাতেক জমি করেছে। বছরে তিনটে চাষ। দু'টো ধান—একটা সব্জি।

ওসব আলু পটলের গল্প রাখুন তো বাঁড়ুজ্যে মশাই। ভাল ছেলে খুঁজে বের করুন। আর রাধিকের তো দিন এসে গেল।

আর ক'মাস?

মাস দেড়েকের ভেতর যা হবে। আমার ভাগ্য বাঁড়ুজ্যে মশাই। মেয়ের ঘরে নাতি হবে—অথচ মা আমার বেধবা!

দু'জনেই চুপ করে গেল। বেলা দশটা বারোটা হবে। অনন্ত নাদুর উঠোন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। শুনুন। ভালো দেখে ছেলে দেখুন। ধুমধাম করে আবার বে দিয়ে দিই মেয়েটার।

অনন্ত রেলবাজারের রাস্তায় ভিড় কাটিয়ে এগোচ্ছিল। কত লোকের কত আশা পূরণ হয়। আমার কেন হয় না? এতো আর ঘোড়দৌড়ের জ্যাকপট মেলানো নয়। একটা কচি মেয়ের বেধবা জেবন ঘোচানো। এ তো সৎ কাজ। এজন্যে একটি পাত্তর জুটিয়ে দিতে পারেন না ভগবান?

দুগ্‌গা ফার্মেসীতে এখন রুগীদের ভিড়। রাখাল গাজীর মুদিখানার সামনে নাদুর লরি দাঁড়ানো। কলকাতা থেকে মালপত্তর গস্ত করে ফিরেছে। সর্ষের তেলের টিন নামছে। নুনের ভিজে বস্তা। বাইরে পাতা বেঞ্চে অনন্ত বাঁড়ুজ্যে বসে পড়লো। আরও দু'তিনজন বসে। খানিক বাদে অনন্তর খেয়াল হলো, বজরা বসে আছে তো। করুক না ডাকাতি। মনটা বড় ভাল ছেলেটার।

অনন্তকে দেখে বজরাও এগিয়ে এলো। কি বাঁড়ুজ্যে মশাই? তোমার মুখখানা শুকনো কেন গো?

কাজকম্ম নেই।

তোমার যা কাজকম্ম—ও তো বেশি থাকা ভাল নয়।

বজরা চুপ করে গেল। রাখাল গাজীর মুদিখানার বাইরে এই বেঞ্চে বসে লোকজন নানা কথা বলে: এখানে বসে দিল্লি, বোম্বাই, কলকাতার কথা হয়ে যায় লোকের। জ্ঞান বাড়ে। চোখ খোলে। অন্য গাঁয়ে সে ডাকাত হলেও এখানে সে ৺খগেন নস্করের পো বজরা। চোখ বুজলেই বজরা দেখতে পায় ফাঁপা রেল পোলের স্লিপার—মাথার ওপর মালগাড়ির ইঞ্জিনটা জ্বলন্ত কয়লা

ফেলতে ফেলতে ছুটোছুটি করছে। নিচে আর পি এফের মুখে সিগারেটের আগুন। পর পর দু'টো বুলেট রেলপাটিতে লেগে খট খট করে শব্দ তুললো। বজরা আর বসতে পারলো না।

শীত বলে রোদে তাত নেই। রেলগেট পেরিয়ে চুনীর সঙ্গে তার দেখা। বজরার খুব সন্দেহ—এ ঠিক কুকুর নয়। বিশেষ করে সেদিনের পর থেকেই তার এরকম মনে হচ্ছে। চুনী নাহলে বাঁশড়ার বাঁশবন থেকে তার ফেরাই হোত না। চুনীর পাহারায় পাহারায় ঘরে ফিরতে পেরেছিল বজরা।

বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখলো, বড়ভাই পুকুর ঘাটে বসে বসেই কোদালে মাটি কোপাচ্ছে।

বজরা এগিয়ে গেল। বসে থাকা অবস্থায় হৃদয় নস্করের কোদালের কোপগুলো সিধে বজরার বুকে গিয়ে পড়ছিল। কি দরকার ছিল অতরাতে পটলক্ষেতে যাওয়ার জন্য বেরোনোর।

বজরার ছায়াটা দেখে হৃদয় চোখ তুলে তাকালো। কখন এলি?

কোন জবাব এলো না বজরার মুখে। বড় ভাইয়ের মুখে এই শীতের দুপুরেও ঘামের ফোঁটা।

তুমি ওঠো বড়দা।

নাঃ। একটু একটু তো হাঁটি। খানিকটা চই আছে মাটির নিচি। সেটা তোলবো ভাবলাম। তোর বউদি বিকেলে কাজের থে ফিরে চই দে মুগির ডাল রাঁধবে নে—

তুমি উঠে বসো তো। আমি কোপায়ে তুলে দিচ্ছি।

না। আমার একটু কোপানো দরকার। না হলি হাত পা আর আগের মত হবে না। সেদিন তো রেল পুলিশ আমারে খুন করার তালে ছেল।

বজরা যেটুকু সরল সহজ হয়ে যাচ্ছিল—হৃদয় নস্করের একথায় একদম কুঁকড়ে গেল। তার চোখের নিচে পুকুরপাড়ে এখন

কেন কোদাল হাতে হৃদয় নস্কর—তা জানে বজরা। সনেকাকে নিয়ে তার শুকনো সংসারে খিদে কখনো চই খোঁজায় না। বাড়ন্ত বয়সের তিনটি খোকা নিয়ে বড়দার ওঠা বসা। তাদের খিদে পেলে বাপ হয়ে ঘরে বসে থাকা যায় না। কিন্তু বড়দাকে কাজ দেবে কে! তার পর এই ভাঙাচোরা দ অবস্থায়। দাদার এ-দশা তারই জন্যে। এ কথাটা মনে পড়লেই বজরা জবুথবু হয়ে যায়।

সনেকা একটি খাস্তা মাগী। সে ঘরে খাবার না দেখলে দিব্যি পাড়া বেড়াতে বেরোয়। এর হয়ে সেদ্ধ ধান শুকোয়—ওর হয়ে তোলে—তাই ভানকির পয়সাগণ্ডাটা পায়। সেই সঙ্গে চালভাজা—নয়তো পান্তা। বজরা নিজে থেকে খেতে চাইলে জংশন চন্দনেশ্বরের রেলবাজারে যে কোন ভাতের হোটেল হাতে স্বর্গ পাবে। তাকে খাইয়ে দাইয়ে অনেকেই নিরাপদ বোধ করে—এটা বজ্রেশ্বর নস্কর লক্ষ্য করেছে।

কথা বলতে বলতে হৃদয় নস্কর বসে বসেই আরেক কোপ বসালো মাটিতে। চই এদেশের শেকড়বাকড় নয়। খগেন নস্কর কোত্থেকে এনে বসিয়েছিল। সে সেই হৃদয়-বজরা ছোট থাকতে। এখন এ চই একটা খাবার। ডালে দিলে একটা ঝাল ঝাল ভাব হয়। আদার চেয়ে ভিন্ন। কিছু ভিন্ন।

বসা অবস্থায় কোদালের ভারে হৃদয় নস্কর গড়িয়ে পুকুরে পড়ে যাচ্ছিল। বজরা দৌড়ে গিয়ে বড় ভাইকে ধরলো। প্রায় চ্যাং-দোলা করে সে হৃদয়কে উঠোনে নিয়ে এলো।

এভাবে হৃদয় আসতে রাজি নয়। ছাড়। ছাড় বলছি। আমি তো হাঁটতি পারি।

খুব হয়েছে। থাক। বউদিদি ফিরবে কখন?

সে তার কাজ হলিই ফেরবে—। বলে হাসতে লাগল হৃদয়।

৺খগেন নস্করের বাস্তুভিটের ওপর শীতের ফিকে রোদ পড়ে ছিল।

তার ভেতর মুখ তুলে হৃদয় নস্কর আচমকাই বললো, তুই এবারে সৎ হয়ে যা বজরা—।

বজরাও তাকিয়ে পড়লো তার বড় ভাইয়ের চোখে।

হ্যাঁ। আমার কথাটা রাখ। সবাই মিলে আমরা তোকে এবার সৎ করে নেব। চাঁদা তুলে—

উঠোনে বসে এমন করে তাকিয়ে তাকিয়ে কথাগুলো বলছিল হৃদয়—যার এক এক ঝাপ্টা বজরার এগালে ওগালে চটাস চটাস চড় হয়ে পড়ছিল। দুপুরে শীতের রোদে বর্ষা রাতের বাঁশড়ার বাঁশবন এসে ঢুকে পড়ছিল। ফাঁপা রেল পোলের স্লিপার ধরে বজরা ঝুলে আছে। হাত দু'খানা পাথর। নিচে আর পি এফের মুখে সিগারেটের আগুন। পাথরের বড়খুড়ো, মেজোখুড়ো, সেঝখুড়ো—ন' খুড়ো। সবাই অন্ধকারে মিশে আছে।

পাঁচ সিকে—আড়াই টাকা করে সবাই দিয়ে দিয়ে তোর একটা বড় জামিন নেব আলিপুরে। একদম বড় খালাশ। তুই আদালতে দিব্যি গাল—আমি আর ডাকাতিতে নেই হুজুর। তাহলিই তো সৎ হয়ে গেলি।

এই বড় ভাইটার জন্যে সে প্রাণে বেঁচে ফিরেছে। নয়তো সে রাতে আর পি এফ ঠিক তাকে গুলি করে পেড়ে ফেলতো। এসব এখন বজ্রেশ্বর নস্করের কাছে পরিষ্কার। তবু তা মুখ ফুটে একবারও বলতে পারে নি বজরা। কাকে বলবে। বড়ভাই সব সময় লেংচে লেংচে চলে বেড়াচ্ছে। দু' একবার পটল ক্ষেতের কথা তুলেছে। কিন্তু উঠে দাঁড়াতে না পারা অব্দি কেউ তাকে পটল ক্ষেতে নিয়ে যাচ্ছে না বুঝেই যেন হৃদয় আর ক্ষেত খামারের কথা তোলে না।

বজরা একগাল হেসে বললো, ডাকাতিতে নেই বললেই তো—চেপে ধরবে। বলবে—তাহলে তুমি ডাকাতিতে ছিলে?

মেনে নিবি। সত্যি কথায় কোন মার নেই বজরা।

আছে। হাজতে নে গে বিষম মারবে।

তো খেলি একটু মার। তার পর তো ছেড়ে দেবে—

না। তা দেয় না বড়দা। তখন তখনই সব পুরনো মামলা চালু হয়ে যাবে।

তাই নাকি ?

বজরা দেখলো, বড় ভাইয়ের মুখখানা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। হৃদয় নস্করের নিজের ছায়া উঠোনে তেরছা হয়ে ঝুলে পড়ছিল। গাঁয়ের লোক সবাই তার বড় ভাইকে বলে—রিদেটা এরকমই।

হৃদয় নস্কর মুখ তুলে বললো, তুই এর মধ্যে গেলি কেন ? আর ফেরা যায় না ?

কিসে ?

এই মামলা ? এই ডাকাতি ? তোকে লোকে ভয় পায়। পুলিশ ? আলিপুর ? সেরাতে তো মরতি বসেছিলি।

ডাকাতি কোথায় দেখলে ?

সে রাতে মালগাড়িতে কি করছিলি ? তুই ভেবে কী পেটান পেটালো পুলিশ আমায়—

এখন নিজের বড় ভাই লেংচে বসে আছে উঠোনে। সেদিকে আর তাকাতে পারছিল না বজরা। স্রেফ আমার জন্যি। আমার জন্যি স্রেফ। এ কথাটা দু'বার মনে মনে আওড়ে নিয়ে জিভ কামড়ে বসলো বজরা। তাওতো বড় ভাই—এই বোকা সোকা মানুষটা—সেদিনের কিছুই জানে না। জানে না—সে তখন কাঁপা রেল পোলের স্লিপার ধরে ঝুলছে। হাত দু'খানা পাথর। একটু আগে মোষে টানা গো-গাড়ি চিনির বস্তা বোঝাই দিয়ে ঘাসে উঠে গেছে। মোটা পাতির ঘাসে ঢাকা মাঠে।

আমি। মাল গাড়িতে ?

হ্যাঁ। তুই। রেল থানার হাজতে পেটায় আর তোর নাম ধরে

ধমকায়। যত বলতি চাই—সে আমি না—সে আমি না—তা কে কার কথা শোনে!

এখনো তুমি মামলা ঠুকে দিতে পারো।

ঠুকি আর ওরা আবার আমারে ঠুকুক্! দয়া করে হাসপাতালে ফেলে দে গেল। নয়তো পথেই কোথাও মরে পড়ে থাকতাম—

বজরা আবার নিজের মনে মনে বললো, শুধু আমার জমি। আমার জমি।

ধানকাটা মাঠের ভেতর দিয়ে হৃদয় নস্করের তিনছেলে তখন ঘরে ফিরছিল। ওরা গরু চরায়। সারা গাঁয়ের গরু। অন্য সব রাখালের সঙ্গে মিশে। দেড়শো দু'শো গরু। পাঁচ থেকে বারো তেরো বছরের খোকা রাখাল সব চারদিক ছড়িয়ে পড়ে গরুদের ঘাস খাওয়াতে নিয়ে যায়। মাথার ওপর খোলা আকাশ। পায়ের নিচে লম্বা মাটি। তাতে গরুরা ধুলোর ধোঁয়া বানায় পায়ে পায়ে। এই মাসখানেক হোল একাজে বেরিয়ে ছেলে তিনটের অনেক কিছু জানা হয়ে গেল। সেসব জানার জিনিস ওরা সন্ধ্যেরাতে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্নে স্বপ্নে ফেরৎ পায়। অনেক পরিষ্কার করে। স্পষ্ট করে।

ছেলেদের মা ঝি-গিরি করে ফিরলো স'চারটের লোকালে।

তারও পরে ফিরলো ছেলেদের খুড়ি। হাতে একটা জ্যান্ত পাখি। পা ভর্তি ধুলো। আকাশটা তখন অন্ধকার হয়ে শীত জমাট করে দিচ্ছিল। মনকা তখন ভাসুরপোদের সামনে পাখিটা মেলে ধরছিল। ঠিক এই সময় হৃদয় নস্কর ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে মাটির বারান্দায় উঠে বললো, তোর এক স্যাঙাৎ এই কাগজখানা দে গ্যালো—

কিসির কাগজ?

তা জানবো কি করে। বলে গেল—বজরা এলি দিও। কোর্টের হবে—আলিপুরির জিনিস হতি পারে—

ফেলে দাও। আমার তো পয়সা নেই হাতে।

বজরা আর ভাবতে পারছিল না। তার ভাবনাগুলো ভাইপোদের খুশিতে—চীৎকারে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল। তারই চোখের সামনে সনকা নস্কর পাখিটার গলা ছিঁড়ে ফেলে বটি নিয়ে ছাড়াতে বসে গেল। উঠোনের গর্তপানা চুলোটা কাঠকুটোয় লাল আগুন মেঘে ধরে উঠলো। পথ হারানো ডাক পাখি। বোধহয় ডানাভাঙা ছিল।

সেদিন বেশি রাতে কঠিন হিমের সঙ্গে চাঁদের আলো জল হয়ে গাছপালার পাতায় পড়তে থাকলো। মালগাড়িটা তার সময়মত বাঁশড়ার বাঁকে গুম গুম করে রেলপোল পেরোলো। রাধিকা চোখ বুঁজেই দেখতে পাচ্ছিল—পুকুরধারে কচুবন থেকে মরা মাছগুলো তিড়িং তিড়িং লাফে জলে গিয়ে পড়ছে। রূপোলী আঁশ কেবল কিছুটা লালচে। বাসী মাছের গা যেমন হয় আর কি! তার ঘুম ভেঙে গেল। উঃ! কী ব্যথা। পেট ভর্তি শুধু জল আর জল। সারা বাড়িতে সবাই তখন মন দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

জেগে ছিল বজরা। উঠোনের কোণের আদাড়ে পাখির পালকের ডাই নিয়ে মাঠের ইঁদুরের পাল নেড়ে চেড়ে দেখছিল। বজ্রেশ্বর নস্কর মাঠের পথ ধরলো। চাঁদের আলোয় হিমের ধার। চারদিকের গাছপালা, খাল, ঘরবাড়ি দমবন্ধ করে পড়ে আছে। তাদের ওপর কুয়াশার সর। সে কুয়াশায় জ্যোৎস্না বিঁধে আছে। এরকম সব জায়গা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বজরা একসময় পায়ের নিচে বালি পেল। সামনেই বড় খুড়ো। ও বড় খুড়ো—বজরার ডাকে কেউ সাড়া দিল না। পাথরের বড় বড় চাঁইগুলো এ ওর গায়ে হেলান দিয়ে পড়ে আছে। শ্যাওলাধরা আঁশফল যেন—বড় সাইজের। এই পাথরগুলো তার বালক বয়স থেকে চেনা। এ দিকটায় গরু চরাতে এসে পরিচয়। কতদিন বড়খুড়োর ওপর বসে ঘুমিয়ে পড়েছে বজরা। সন্ধ্যের আঁধারে বড় খুড়ো আর

মেজোখুড়োর ভেতরকার ফাঁকে গজানো ঘাস এক ঝলকা হাওয়া পেয়ে দুলে উঠেছে। ঘুমন্ত বজরার পিঠে সেই খরো খরো ঘাসের ছোঁয়া আদর হয়ে লাগতো তখন। ও বড়খুড়ো—। বড় খুড়োরে—

বজরার গলা আকাশে উঠে দলা দলা কুয়াশায় বিঁধে যেতে লাগলো। আবার ডাকলো বজরা। বড় খুড়োরে—

তার গায়ের পাশ থেকে খুব ভারি গলায় কে বললো, বলো। কি বলতি চাও।

বজরা থর থর করে কেঁপে উঠলো। তার সামনে আবছা আলোয় বড় খুড়ো, মেজো, সেঝো, ন'খুড়ো গায়ে গা আলগা দিয়ে ঢলে পড়ে আছে। তাদের গায়ের ফাঁকে ওড়া-মাটির গদগদে পলিতে বড় বড় ঘাসের ঠেলে ওঠা মাথা। একটা দুটো রঙীন ফুল —তাদেরও এখন কালো দেখাচ্ছে।

বলো। কি বলতি চাও ?

এ-গলা রেলপোলের বড় বড় থাম্বায় গিয়ে ধাক্কা মারলো। নদীর শুখো বুকের ওপর গম গম করে কথাগুলো গড়াগড়ি দিলো। একটু আগে ঘর ছেড়ে বেরোনোর সময় বজরা বাঁশের মাচা থেকে সাবধানে নেমেছে। আওয়াজে পাছে সনেকার ঘুম ভেঙে যায়। আজ সন্ধ্যে থেকেই সনেকার গায়ে ডাকপাখির গন্ধ। হয়তো কোন ঠাণ্ডা দিঘিতে চান করতে নেমে শীত লেগে পাখিটার ডানা অবশ হয়ে যায়। এখন বজরা নদীর শুখো বুক থেকে ডাকপাখির গন্ধ উঠে আসছে টের পেল।

আবার সেই গলা। বলো। কি বলতি চাও ? আমরা সবাই আছি এখানে—

সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে মেজো, সেঝো, ন'খুড়োর গলা সমান গম গম করে উঠলো। বলো। কি বলতি চাও বলো ?

আমি কি সৎ হতি পারি ?

ঠাণ্ডা বাতাসে ডাকপাখির গতরের গন্ধ। একই সঙ্গে কতকগুলো হো-হো হাসি সে-গন্ধ লণ্ডভণ্ড করে দিল।

বজ্রেশ্বর নস্কর আরও জোরে চেঁচিয়ে বললো, আর কি সৎ হওয়া যায়? তখনই এ-পৃথিবীর কোন জ্যান্ত জিনিস হাজির হোক বলে মনে মনে খুব চাইছিল বজরা। না হোক—সেই মালগাড়িটাই ঢিকোতে ঢিকোতে ফিরে আসুক। তবু তো চেনা জিনিস।

খুব হওয়া যায়। কেন যাবে না?

বজরা মনে মনে বললো, কেমন করে?

থানায় গিয়ে বলো। আমার পয়লা বউ যে আত্মঘাতী হবে—আমি জানতাম। জানতাম বলেই ফলিডল দিয়ে আলুর চপখানা ভিজিয়ে রাখি। সেই খেয়েই তো!

এ সব কথা শুনে বজরার শীত করতে লাগলো। সে পরিষ্কার বুঝলো, গো-গাড়ির ছাড়া মোষগুলো আড়ালে আবডালে মস মস করে ঘাস খাচ্ছে। বিরাট কালো গা নিয়ে তারা অন্ধকারে মিশে আছে।

হাজতে ভীষণ মারবে।

তাতো ব্যথা লাগবেই। এই খ্যাপাটে নদীটার ঢেউ ভাঙতি আমাদের আনা। ওপরে মালগাড়ি থেকে এই প্রবল নদীতে আমাদের ফেলে দিলো। ব্যথা লাগেনি তখন? তারপর জল সরে গেল। আলো এলো। অন্ধকার এলো। একদিন ব্যথা না পেলি এসব পেতাম!

বজরা আর মানে বুঝতে পারছিল না। সোজা রেল পোলে গিয়ে উঠতে লাগলো। ও খুড়ো মশাইরা। আমার জন্যি আমার বড় ভাই রিদয় নস্কর—

আর বলতি হবে না। আমরা সব জানি।

রিদয় নস্কর কি কোনদিন উঠে দাঁড়াতি পারবে?

খুব পারবে বজরা। খুব পারবে। তাড়দায় যে ঘরে আগুন

দিলে—সে ঘর কি ফিরে ছাওয়া হয়নি ? কোন কাজ বন্ধ থাকে না।

আমি আগুন দিতি চাইনি বড় খুড়ো।

ও বললি চলবে কেন ? তুমিই তো দিলে। সে কথা বলো গে—

আলিপুরে কবুল করিনি বড় খুড়ো। এ কথা বলতে বলতে বজ্রেশ্বর দেখলো, নিচের খুড়োমশায়রা তখন নড়ে চড়ে হাসছে। কত কালের পাথর ! এই প্রথম নড়তে দেখলো বজরা। সে তখন ফাঁপা রেলপোলের মাথায়। এখন কোন মালগাড়ি নেই। বোধহয় চলে গেছে। বাঁ ধারে বাঁশড়ার সেই বিখ্যাত বাঁশবন। মাথার ওপরে পরিষ্কার আকাশে ভ্যাবলাকান্ত চাঁদ। কি যে হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীতে কিছুই জানে না। জানার চেষ্টাও নেই। বজরার খুব ভয় হোল। তাকেও কি শেষে পাথরে পাবে ! নিচের পাথরগুলো কতকালের। নদীর জলেই ডুবে ছিল বিশ পঞ্চাশ বছর। বজরা এক দৌড়ে চন্দনেশ্বর স্টেশনের দিকে ছুটতে গেল। পারলো না।

স্পষ্ট পুরুষ গলায় ভাঙা হাসির ধাঁচে কে কাঁদছে। রেললাইনের গায়েই কচুবনে ঢিবিমত একটা অন্ধকার। সেখান থেকেই কান্না উঠে আসছিল। মোষ তো এ গলায় কাঁদে না। বজরা রেল লাইন থেকেই কয়েকখানা পাথর তুলে নিল।

আর অমনি কান্না ঘুরিয়ে চেনা গলা বেরিয়ে এলো। মারিসনে বজরা ! মারিসনে ! আমি পালান। মিস্ত্রী পাড়ার পালান।

ওঃ। পালান মিস্ত্রী ? নিশুতি রাত্তিরে এখানে। তুই না রাজসাক্ষী !

আর লজ্জা দিসনে। আমার সহোদর বিলে তো এখনো তোমার সাঙাৎ।

সে হোল গে বাপের ব্যাটা। আজ তোরে এখানে পুঁতে রাখবো। কোন্ পুলিশে বাঁচায় দেখি।

তা রাখো। কোন আপত্তি নেই। তোমার খোঁজেই এখানে আসা। কতকাল ডাকাতি করিনে দু'জনে। আবার একবার—

ভড়কে গেল বজরা। এ বলে কি রাজসাক্ষী। কথাটা উকিলবাবুর মুখে শুনে শুনে তার এখন মুখস্থ। হিম ভর্তি বাতাসে চোখে আরাম লাগলো বজরার। রাজসাক্ষী তো আরামের কাজ পালান—

কচু আরামের! আদালতের পুলিশের গায়ে গায়ে থাকতি হয়। যখন যা বলে শুনতি হয়। নিসপেকটর বাবু শুধু শাসায়। তার চে তো আগেই ভাল ছেলাম। ছুটে বেড়াও। ওয়াগন ভাঙো। মালগাড়ির ডালা খোলোরে। কত সুখ বজরা!

এখন তুই ধরা পড়লি তো তোর আর ছাড়ান নেই।

ধরা পড়বো কেন বজরা? তোর সঙ্গে এই অন্ধকার রেল লাইনে উড়ে বেড়াবো। এখন তো তবু লুকিয়ে লুকিয়ে বউয়ের সঙ্গে—মায়ের সঙ্গে দেখা করতি আসি। এর চেয়ে ধরা পড়া অনেক ভাল বজরা।

নাঃ পালান। এ আর ভাল লাগে না। এপথে বন্ধু শত্তুর হয়। ত্থাখনা কেন—তোর সহোদর বিলে এখন আমায় দেখলি রাস্তা পালটায়।

তাতো পালটাবেই। চিনি বেচা কাঁচা পয়সা হাতে। দেবো ঘাড় ভেঙে?

কোন লাভ নেই পালান। এক ডাকাতির পয়সা তিন ডাকাতির মামলা শুষে খায়। শুধু হয়রানিই সার। সবাই ভয় পায়। এ আর ভালো লাগে না।

পালান অবাক হয়ে বজরার মুখে তাকালো। অন্ধকারে সেখানে চোখ দেখতে পেল না। শুধু বিড়ির আগুনটা নাকের ডগায়।

বজরা বললো, এত জায়গা থাকতি এখানে কি করে এলি পালান?

চলে আলাম। এ জায়গাটা রোজ আমারে ঘুমের মধ্যি দেখা দেয়। চোখের সামনে নাচে। বলে—আয়! চলে আয় পালান! আজ রাত্রির ছু'টোয় মালগাড়ি যাবে। এক বস্তায় এক কুইন্টল চিনি।

আয় পালান—এ পথ ছেড়ে দি।

আদালত তো ছাড়বে না। উকিলবাবুরা তো ছাড়বে না।

ধরা দেবো পালান।

বেদম মারবে। তারপর জেল জরিমানা—সামলাতি পারবা?

আমাদের জেবনে আছে কি পালান! কাঁটাছেঁড়া। জবরদস্তি। প্রাণটা হাতে নে মালগাড়ির ডালাভাঙা। তার চে জেল জরিমানায় অনেক শাস্তি পালান।

বাঃ! বাঃ! তুমি তো সাধু হয়ে যাচ্ছো বজ্রেশ্বর।

বজরা কোন কথা বললো না। তার কানের ভেতর তখনো বড় খুড়োর গলা। বলো। কি বলতি চাও?

পরদিন রেল বাজারের কুকুরদের মিনিষ্টার দেওয়ান বেলাবেলি নাছু শী-র গদিতে গিয়ে হাজির হোল। শী-মশায় নাতির মুখ দেখে সুখ পাচ্ছো। ভালোয় ভালোয় তোমার বিটি বিয়োল। এবার আমার পুষ্যিগুলোরে ছু'টি খেতি দাও। ওরা সুখী হয়ে তোমার নাম করবে।

রাধিকা সুস্থ হয়ে চোখ চাইতে নাছু গদিতে এসেছে। একচালান বাসন এই খানিক আগে শশী বৈঠকখানা বাজারে নিয়ে গেল। নামে কাজ নেই। ওদের সরা তো—

দেওয়ান চেঁচিয়ে উঠলো। ও চুনী। এট্টু তফাতে যা। শী-মশায় তোদের খুশী করে খাওয়াবে।

চুনী আজকাল মানুষের ভাষা বোঝে। বাংলাও বোঝে। সে লেজ তুলে তার তিনবন্ধু নিয়ে রাখাল গাজির মুদিখানার কাছাকাছি চলে গেল। চুনীর বিরুদ্ধে রেলবাজারে আজকাল নানান

অভিযোগ শোনা যায়। সে নাকি আদরে বাঁদর হয়ে পড়েছে। এর ওর পায়ে কুট করে কামড় দিয়ে বসে।

নাড়ু শী একখানা পাঁচটাকার নোট এগিয়ে দিতে মিনিষ্টার দেওয়ান হাত গুটিয়ে নিল। ওতে হবে না শী-মশায়।

কেন হবে না? খাওয়াবি তো কুকুরদের। যত বাজারে কুকুর!

ওভাবে যদি ভাবেন তো দরকার নেই।

নে। নে। রাগ করিস কেন? দশটা টাকা নে। কবের থে এ কুকুর ব্রত নিলি!

চুনীর তাকানোটা দেখুন। কেমন সরল। সিধে। ঘোর প্যাঁচ নেই কোন।

সব কুকুর ওভাবেই তাকায় দেওয়ান। প্যাঁচ থাকলি তো কুকুর ট্যারা হয়ে তাকাবে!

ভালো করে দেখুন।

দেওয়ান এরকম আপনি তুমি মিশিয়ে সবার সঙ্গে কথা বলে। যাবার সময় বললো, আর সাতটি টাকা দিন।

দিয়ে নাড়ু জানতে চাইলো, কি খাওয়াবি?

ভেটকি মাছের শিরদাঁড়ার চচ্চড়ি। কাতলার মাথা দে মোটা চালের মুড়িঘণ্ট। কষা করে টেংরির ডালনা—

চুনী কিন্তু অ্যাতো সব খেয়ে পেটের ধাত ছেড়ে দেবে।

বছরে একবার ভাল করে খাওয়াতে হয় শী-মশায়। নয়তো ওদের স্বভাব খারাপ হয়ে যায়। মানুষের সঙ্গে বসবাস করা জীব। গত সনে রাখাল গাজি কত করে খাওয়ালে ওদের—

দু'দিনের মাথায় রাধিকা তার ছেলের মাথার নিচে সর্ষের বালিশ গুঁজে দিয়ে আশপাশের বাচ্চাদের খবর দিল। সন্ধ্যেবেলা ছেলের কল্যাণে আটকড়াই ফুটকড়াই বিলি হোল। জ্যোৎস্না রাতে বাচ্চারা কোঁচড়ে খই, ভুট্টা, মুড়ি বেঁধে নিয়ে যে যার ঘরমুখো। ফাঁকা দোতলায় লাবণ্য ইলেকট্রিক আলোয় সুতোর ফোঁড় তুলছিল।

সামনে এখনো ভরা শীত। তাড়াতাড়ি তিনখানা কাঁথা বানাতে হবে তার।

বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা। নাড়ু শী তখনো গদি থেকে ফেরেনি। অন্ধকার ঘরের ভেতরে চওড়া একফালি জ্যোৎস্না নতুন খোকার অয়েলক্লথ গিয়ে ছুঁয়েছে। ঢাকা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাধিকা সজনে গাছে ঝুলে থাকা খাঁড়ার দিকে তাকিয়ে ছিল। কার খুব চেনা গলা স্পষ্ট হয়ে তার কানে গেল।

পড়িমরি করে রাধিকা নিজের ঘরে আসতেই স্যাঁৎ করে কে সরে যাচ্ছিল।

রাধিকা চেঁচিয়ে উঠলো। ডাঁড়াও—

একটা মরা হাসি হেসে রঘুনাথ বারান্দায় মিলিয়ে গেল। রাধিকা তখন ক্ষ্যাপাচণ্ডী। ডাঁড়াও বলছি। নিজি অপঘাতে মরে আমারে তো শেষ করলে—

লাবণ্য গলা তুললো। কার সঙ্গে কথা বলিস রাধিকে?

তুমি চুপ করো তো মা। বলতে বলতে রাধিকা খোলা জানলায় চলে গেল। রঘুনাথ তখন পুকুরধার ধরে সজনেতলায় চলে গেছে। পিঠে পাঞ্জাবীর ওপর সজনে পাতার ছায়ায় চেরা ঝিরঝিরে জ্যোৎস্না। মাথার চুল আগের মতই আছে।

দোতলায় জানলা থেকেই রাধিকা চেঁচিয়ে উঠলো। নির্লজ্জ কোথাকারে! কে বলেছিল বাহাদুরি দেখাতে? নিজি মরে শান্তি নেই। শেষে খোকাকে ধরে টানা—

লাবণ্য উঠে এসেছিল। কাকে বকিস মা?

আর কে? বলতে বলতে রাধিকা ধুপ ধাপ পায়ে অন্ধকার ঘরে এসে সুইচ টিপলো। তারপর ছুটে গিয়ে খাটের ওপর আসন পিঁড়ি বসে তুলতুলে মানুষের ছানাটি কোলে নিল। অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কপালের ওপর বাসন্তী রঙের কোন ফুলের রেণু উড়ে এসে পড়েছে হয়তো। রাধিকা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল।

কার সঙ্গে কথা বলছিলি রাধিকে ?

তোমার জামাই।

লাবণ্যর হাত থেকে ছুঁচটা পড়ে গেল। বলিস কি ? ঠিক দেখিছিস ?

পষ্ট দেখলাম। এমন হ্যাংলামো ! ঘেন্না ধরে যায় মা। মরে গিয়েও নিজির জ্যান্তা ছেলেরে হামি খেতি আসে কেউ ? লজ্জা ! লজ্জা ! আমার এ দশা করেও শান্তি নেই মানুষটার ? রাধিকা আর কথা বলতে পারলো না। হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। সে কান্নায় গভীর ঘুম থেকে তার ছেলে নড়ে চড়ে উঠলো। পরিষ্কার চাহনি। নাকের লালচে ফুটোয় ইলেকট্রিক আলো ঢুকে যাচ্ছিল খোকার।

আজ ক'দিনে হৃদয় নস্কর দেওয়াল ঘেষড়ে হাঁটতে পারে। তালগাছ, সুপুরিগাছ, জিওলগাছ ধরে ধরে এমাঠ সেমাঠে ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে যায়। হৃদয় নস্করের বুকে এত সাহস যে কোত্থেকে আসে, লোকে বুঝে পায় না। চাষ নেই। কোন রোজগার নেই। বউটা যাদবপুর সন্তোষপুরে ঝিগিরি করে ফেরে। কোনদিন আঁচলে চাল বেঁধে ফেরে। কোনদিন বা একজোড়া ডিম। নয়তো লম্বাপানা দু'খানা চিচিঙ্গে।

হৃদয় নস্করের চাপ দাড়িতে ক'টি শাদাপানা পাকা দাড়ি চকমক করে। কালো মোটা ভ্রূ। হাসলে কোদালে-দাঁতের পরেই নাক খানা চোখ টানে। ঝিগিরি করে ফেরার পর তিন খোকার মা মাঠের দিকে তাকিয়ে কখনো কখনো খোকাদের বাপকে ডাকে। বাপটি তখন লেংচে লেংচে এগাছ সেগাছ ধরে—আলে হুমড়ি খেয়ে মাঠ ভাঙে। এক একদিন সে ডাকে ফিরে এসে হৃদয় নস্কর খলখল করে হাসে। আবার হাঁটা শিখতি হবে কোনদিন ভাবিনি।

কোথায় যাচ্ছিলে ?

ভাবলাম—ধান তো কাট হয়ে গেল সবার। এবার সিধে পথে মাঠটা ভাঙি। তারপর পটল ক্ষেতটা দেখে আসি।

সেসব কিছু কি আর আছে এখন! থাকলেও ছাড়া গরু তার দফা নিকেশ না করে থামবে?

ওই মনে করেই বেরোই—তাতেই তো আমার হাঁটাহাঁটি হয়ে যায়।

সত্যি কথা বলো তো! তুমি শুধু হাঁটতে বেরোও?

হৃদয় নস্কর তার ভাঙাচোরা বউয়ের দিকে তাকালো। মাঘের মাঝামাঝি বিকেলে ধানকাটা মাঠের ওপর সন্ধ্যের আঁধার মাখানো ফিকে আলোয় খোকাদের মাকে খুব দূরের লাগলো। আমি তো আয় করিনে। তুমি ঝিগিরি করে আমাদের খাওয়াও।

সেই পুরনো কথা তুলো না তো। তোমার তিন খোকাই তো এখন রোজগেরে—

ওদের বয়সে আমি রাখালী করতি গিয়ে মাঠে গাইয়ের বাট থেকে দুধ খাতাম।

সেসব দিন তো আর নেই।

ওরা এখন ইঁদুরের গর্তের থে ধান কুড়িয়ে আনে। এক এক ধামা হয়ে যায় এক একদিন।

খোকাদের মায়ের চোখ কেঁপে উঠলো। কোনদিন না সাপের হাতে পড়ে। তোমার বড় খোকাটি একটু হাবলা ধাঁচের—

হৃদয় নস্কর হেসে বললো, ও তো তোমারও বড় খোকা! তারপর আবার হো হো করে হেসে উঠে বললো, আমি একসময় বাড়ির বড়খোকা ছেলাম।

হৃদয়ের বউ বললো, রোসো। আজ তোমাগে একটা নতুন জিনিস খাওয়াবো। বাবুগে বাড়ি শেখলাম।

তা করো। কিন্তু খোকারা ফেরেনি।

ওরা ঠিক ফিরে আসবে। এই তো ফেরার সময়। কোন দূর

মাঠে গে ধানের খোঁজে ইঁদুরের গর্ত খোঁচাচ্ছে। আমার সব সময় ভয় করে।

ভয় করে লাভ নেই বউ। এই করেই তো লায়েক হয়ে যাবে একদিন। কিন্তু ওদের খুড়িমা কোথায়?

কে? সনেকা? ছাখোগে কোন্ বাড়ি গে ধান সেদ্দ শুকনোতে জুটে গিয়ে বসে আছে। আচ্ছা বলতো—তুমি কেন মাঠ ভাঙো রোজ? শুধু পটলক্ষেত?

তা নয়তো কি?

উহু। আমার মন অন্য কথা নেয়।

অন্য আর কি বউ। এই মাঠটা পেরোলেই যে আকাশখানা পড়ে—তাতে সন্ধ্যে সন্ধ্যে চিত্তিরবিত্তির রঙ ফোটে। মনে নেয়—সামনে বুঝি কোন ভালোদিন আসবে। এগিয়ে গে সেটা দেখি।

তোমার খুব আশা! খুব আশা! আশা থাকা ভালো।

বউয়ের একথায় কোন জবাব দিল না হৃদয় নস্কর। এখন সে খানিকটা হাঁটতে পারে। বজরা বড় একটা তার চোখের সামনে আসে না। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়। খোকাদের মা বাড়ির পুকুরে পা ধুতে নামলে হৃদয় নস্কর আবার মাঠে নেমে পড়লো। এ মাঠখানা ভেঙে ফেলতে পারলে সে আজ মিস্ত্রী পাড়ায় বজরার কথাটা তুলবে। অনেকদিন ধরে ঠিক করে রাখা কথা।

ফাঁকা উঠোনে খোকা তিনটে থাকলে তবু বাড়িটা জমে ওঠে। আর ক'দিন পরেই দখিনা বাতাস উঠবে। বিকেলের দিকে। সে-বাতাসে হৃদয় বাতাসের চোকলা তুলে ভেতর থেকে আশার বীজ দেখতে পায়। এক রকমের আশার দানা। তাতে রঙ থাকে। আশার একটা নিজের গন্ধও আছে। ভালো সময়ের গায়ে হৃদয় নস্কর সব সময় বাসন্তী রঙ দেখতে পায়।

মিস্ত্রী পাড়ায় ছ'পাইপের একটা টিউকল ছিল। সেটা বিগড়ে আছে আজ বেশ কিছুদিন। তাই নিয়েই কথাবার্তা—সলা

চলছিল। তার ভেতর হৃদয় বললো, আমি একটা কথা বলবো। আমাদের বজরারে ভালো করে নিতি হবে।

সবাই তাকিয়ে পড়লো। এই সময়টায় সবার ঘরে কিছু না কিছু ধান। গপ্পগাছার সময়—ধান রোয়ার পর আর এই মাসখানা ফের।

বজ্রেশ্বর আপনাদের সারা গাঁয়ের বেপদে আপদে দাঁড়ায়। তার বেপদে আমরা দাঁড়াবো না!

কথাটা খুব মিথ্যে নয়। এগাঁয়ে কেউ খুব মাথা তুলে দাঁড়াবার মানুষ নেই। তবু বাইরের লোক এসে যে গাজোয়ারির সাহস করে না—তার মূলে তো বজ্রেশ্বর।

টিউকলের চাঁদার সঙ্গে সঙ্গে যে যা পারেন দিন। আমরা ওর জামিন আনাবো। ওরে সৎ করবো। যদি পারেন কেউ—ভাগে জমির ব্যবস্থা ত্যাখেন না। আমার সহোদর বলে বলি না—

বয়স্কদের মধ্যে ভগবান মোড়ল জ্যোৎস্নার ভেতর বারান্দার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসেছিল। সে দাঁড়িয়ে উঠে বললো, আমাদের রিদেটার কোন হেলডেল নেই। সেই একই আছে। তা চাঁদা কত করে?

আমি তো আলিপুর জানিনে। আমার জমি জায়গাও নেই। আপনারাই চাঁদা ঠিক করেন।

হৃদয় নস্করের গলার স্বরে—দাঁড়াতে চেষ্টা করার ভঙ্গীতে—কী একটা বিশ্বাসের ভাব ছিল। সবাই রাজি হয়ে গেল। যে কোনো টাকা দিতে পারবে না—সে-ও বললো, দশ পণ খড় দিচ্ছি। বেচে টাকাটা নিয়ে নে রিদে—একটা লোক সৎ হয়ে যাবে—সে তো বড় কথা।

একা একা হাফ লেংচে বাড়ি ফেরার পথে হৃদয় নস্কর আবার বাসন্তী রংয়ের আশার সোয়াদ পেল মুখে। বাতাসের ভেতরেই আজ সকাল থেকে সে আশার বীজ দেখতে পাচ্ছিল। রসুনের কোয়া মত। অথচ রংখানা শাদা নয়।

বাড়ি ফিরে দেখলো, খোকা তিনজন তাদের খুড়িমার গায়ে গা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বারান্দায় খেজুর পাতার খোলপের ওপর। উঠোনের চুলোয় খোকাদের মা কি চাপিয়ে বসে। বাতাসে সে রান্নার সুগন্ধ। খিদে চারিয়ে দেবার বাস।

ছয়

জংশন চন্দনেশ্বরের আকাশে এখন রাতের বেলায় চাঁদকে ঘিরে একটা সিঁদুরে বালা। উঠোনে হাঁটি হাঁটি পা পা অবস্থায় হাঁটা রপ্ত করতে করতে হৃদয় নস্কর বলে, বৃষ্টি হবে।

ঝিগিরি করে ফেরা তার বউ সন্ধ্যে সন্ধ্যে উনুন জ্বালিয়ে হাত পা সেঁকে। সে বলে, এই শীতের সঙ্গে বৃষ্টি নামলি আমি গেছি। তাহলি বাঁচবো না।

হৃদয় নস্কর চুপ হয়ে যায়। সে বোঝে। সেই কোন্ ভোরে তার বউকে বেরোতে হয়। হৃদয় চারদিক তাকায়। যদি বাসন্তী রঙের বাতাস চোখে পড়ে। ধানকাটা মাঠের ওপর ফিকে চাঁদের আলোয় গোলা কুয়াশা। এরকম তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক একদিন হৃদয় দেখতে পায়—সনেকা ফিরছে। হাঁটু অব্দি ধুলো। গায়ে জামা নেই। শাড়ীর পাড় ছেঁড়া। হাতে হয়তো ছ'সাতটা রাঙা আলু। কিংবা কোনদিন বড় বড় তিনটে বুনো কাকরোল। ও জিনিসে তেমন কোনো তরকারি হয় না। তা জানে সনেকা। এগিয়ে এসে তার বউকে বলে, এই দিদি পোড়াবি? নুন আর তেঁতুল মেখে খাবো। ওরা কোথায়?

ওরা মানে সনেকাকে খুড়ি ডাকার তিন কচি রাখাল। হৃদয় নস্করের তিন বেটা। তাদের ঘুমোতে দেখে সনেকা নিজেই গিয়ে জাগারে। ওঠসে, ছাখ কী আনিছি।

হৃদয় নস্কর উঠোনে বসে বসে দেখে—তিন তিনটে বাঘের ছানা

চোখ কচলে উঠে বসে। এক একদিন হৃদয় জানতে চায়—বজরা কোথায়? সেই সাত সকালে বেরোয়। কখন ফেরে?

সনেকা কিছুই হয়নি এভাবে বলে, যখন বেরোয়—আমি তখন ঘুমে। ফেরে যখন—তখনো আমি ঘুমোই।

যায় কোথায়? খায় কোথায়?

কিছু জানিনে।

এ তো ভাল জ্বালা। এর চেয়ে ডাকাতি ভালো ছিল। ফের ও ডাকাতি করুক।

মন যা বলে—তাই করবেনে। পুরুষমানুষ তো।

হৃদয় আর কথা বাড়ায় না। গায়ে গায়ে তিনখানা গাঁ। খড় বেচে, কড়াই দানা বেচে—সবাই কিছু না কিছু দিয়ে বসে আছে ভগবান মোড়লের হাতে। বজ্রেশ্বর নস্কর সৎ হোক। গাঁয়ের বল ভরসা। কিন্তু ইদিকে সেই বজরাই বেপাত্তা। কোথাও কোন নতুন ঝামেলি পাকায়নি তো। ভাবে আর হৃদয় উসখুস করে। ততক্ষণে উঠোনের উনুনে বুনো কাঁকরোল চিড়বিড় করে পুড়তে শুরু করেছে।

দেওয়ান শুয়ে পড়ার আগে শেষবার চোখ বুলিয়ে নেয়। আকাশে যতদূর চোখ যায়—ততদূর। নাঃ। বৃষ্টির চান্স নেই। তারপর শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। তার কচ্ছপগুলো মাটির মেছলায় চিৎ হয়ে শুয়ে। কোনটা যদি বেরিয়ে পড়ে তো কাছাকাছি থেকে চুনী চেঁচাবে।

নতুন পৌষ-ধানের চিটে পুড়িয়ে ঘরে আগুন করেছে সরোজপ্রভা। ধিকি ধিকি আগুন। তার গুমো গন্ধে কাশতে কাশতে উঠে বসলো অনন্ত বাঁড়ুজ্যে। জানো সরোজ—সেবারে আমাদের এজমালি বাগানেও জল উঠলো। বাঁশড়ার বাঁশবন তখন ছিল না। রেলপোলের গা ধরে সবটাই একটা ক্ষ্যাপাচণ্ডী নদী। সেবারে বর্ষায় আমাদের বাগান আর নদী এক হয়ে গেল। একরাতের ভেতর। অথচ আগের সন্ধ্যেবেলাতেও জোছনা উঠে

বাগানটা হাসছিল। আমরা সন্ধ্যে করে খেলিছি। আর এক রাত্তিরে সব একাকার। কাকা তো এসব জানেন না। আগের বিকেলে পৃথ্বীরাজ কাপুরকে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন। দু'বন্ধুতে দোতলায় কাঠের ঘরে বসে গান গেয়েছেন। আমরা দূরে দূরে দাঁড়িয়ে শুনিছি। পরদিন ওরা উঠে দেখেন কাঠের সিঁড়ির অর্ধেকটা জলে ডুবে।

বে হয়ে এসে আমি ঘরটা দেখিনি। তবে ভাঙা সিঁড়িটা ছিল।

সরোজপ্রভাকে থামিয়ে অনন্ত বললো, বাধা দিয়ো না ভুলে যাবো প্রভা।

সত্যিই ভুলে গেল অনন্ত। একদম অন্য জায়গা দিয়ে শুরু করলো। আজকাল মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখি—বুঝি বিকেল হয়ে গেল! এইতো কার্তিক মাসে—নাঃ। বোধহয় অঘ্রাণে—মাথার কাছের খোলা জানলায় দেখি নাড়ুর কাছে বন্ধকী জমিতে পাকা ধান হলুদ হয়ে নুয়ে আছে। তার ওপর একখানা হলুদ চাঁদ গোল হয়ে ঝুলছে সরোজ। আমার মনে হোল—বুঝি বিকেল হয়ে গেল।

নিশুতি-রাতে? বিকেল?

হ্যাঁ সরোজ। ঢিলে মত চন্দ্রকিরণে রাত্তিরটা ঘন বিকেল হয়ে আসে। আজকাল তো বিশেষ কিছু মনে রাখতি পারিনে। সব ভুলে যাই।

সেই তোমার সিনেমা-কাকার গপ্প বলছিলে।

ও হ্যাঁ। তা নদী ভাসা এক কুমীর ঢুকলো বাগানে। খুড়োমশাই এক গুলিতেই তাকে সাবাড় করলো। অব্যর্থ টিপ ছিল। পৃথ্বীরাজ তো কুমীর দেখেনি কোনদিন। ধর্মের বইতে শুধু কেষ্ট, নয়তো—অর্জুন সাজতো।

তোমার সিনেমা-কাকা?

তিনিও সাজতেন।

তুমি সিনেমায় নামোনি কেন?

দূর পাগল! সবাই পারে? না, সবার হয়?

খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। ইলেকট্রিক ট্রেনের শব্দ মাখানো রেলবাজার অনেকক্ষণ সময় নেয় শান্ত হতে। নয়তো দূর থেকে বাজারের একটা বিজ বিজ শব্দ সব সময় শুনতে পাওয়া যাবে। এখন সে শব্দ নেই। বরং নিশুতি নিশুতি ভাব। তার ভেতর অনন্ত বাঁড়ুজ্যে বলে উঠলো, সে-এজমালি বাগান এখন বড় তরফের নাতিদের হাতে। তারা গাছ কেটে রঙ কারখানা করেছে। ওখানে কিন্তু খুড়োমশাই এখনো আসেন।

কি বলছো তুমি?

হ্যাঁ সরোজ। আমি দু' একদিন সন্ধ্যের দিকে বাগানে ঢুকে বুঝতে পেরেছি। কেমন একটা সর সর ভাব এসে যায় গাছ-পালায়—তিনি বাগানে ঢুকলে। আমি তাঁর হাসি শুনতে পাই। একদিন দেখো, ও রঙ কারখানা উঠে যাবে। খুড়োমশাই নিজিই একদিন তুলে দেবেন।

আবার চুপচাপ। আবার অনন্তর কথাবার্তা। ওই যে দেখছো চাঁদকে ঘিরে সিঁদুরে বালা—ওকে বলে চন্দ্রসভা। ওই সভা চাঁদের যত দূরে যাবে—তত বৃষ্টির দিন এগিয়ে আসবে। অনেকদিন পরে সরোজপ্রভার খুব ভালো লাগতে লাগলো।

পৃথিবীর যে কোন লোকবসতির মতই এখানেও অনেক লোক একসঙ্গে নিঃশ্বাস নেয়। নিঃশ্বাস ফেলে। অন্ধকার এখানেও আসে আঁধার করে। তারকেশ্বর করে এখানেও লোকে কুমড়ো হাতে ফেরে। ন্যাড়া মাথায় শিখি। গায়ে সত্ত ছোপানো বস্ত্র। আর ক'দিন পরেই রেলগেটের এপারে পঞ্চাননতলায় খোল বাজবে।

এমনিতেই হৃদয় নস্করের ঘুম ভাঙে ভোর ভোর। বউ রওনা হয়ে গেছে পয়লা গাড়িতে। নিজের পা ডলে ডলে দেখছিল

হৃদয়। এখন সে কিছু না ধরেই হাঁটতে পারবে। সে আবার আগেকার হৃদয় নস্কর হয়ে যাবে। পরের বেড়া বাঁধবে দিনমজুরীতে। এই তো মাটি কাটার সময় এসে গেল। এবার গেরস্থদের পুকুর কাটা শুরু হবে। শুরু হবে লাথগঞ্জের ইঁট বানানো।

হৃদয় নস্কর মাঠে নেমে পড়লো। শীত চলে যাবে বলে বাতাসে তার উদ্যোগ। বেশী দূর এগোনো হলো না হৃদয়ের। আশ শ্যাওড়ার দাঁতনকাঠি হাতে ভগবান মোড়ল। তোর ভাইটে কোথায় রিদে? দেখিনে যে মোটে—

সামনে আসে না।

হাজার হোক ডাকাতির মানুষ তো। চান্দা তুলিছি—একথাটা কানে গেছে।

যায় তো যাক না ভগবানদা।

তুই কিছু বুঝিসনে রিদে। বজরা তো ছিঁচকে চোর নয়। রাজবৃত্তি! ডাকাইতি !! তার মনে তো লাগবেই রিদে। ডাকাইতির তো একটা মান আছে। লোকে ডরায়।

তা ডরায় তো ডরাক।

আসল কথা মানী মানুষের মান ভাঙলে থাকে কি রিদে? তারে সৎ করবো বলে থানার প্যালা তুলিছি চাঁদা করে—উকিলবাবুদের টাকা তুলিছি—এ তো তার মানে লাগবেই।

তাই পাইলে বেড়ায়? তা বেড়াক না। আমরা তো বজরাকে এবারে সৎ করে নেব।

একটা খোকা হওয়ার দরকার বজরার। জানিস রিদে।

তা না হলি আমি কি করবো?

এবার হবে দেখিস। ভাগের জমি করবে। ধান হবে। সনেকা মা আমাদের গাভিন হবেন। আমড়ার চাটনি, শোলের ঝোল দিয়ে সাধভক্ষণ হবে। দেখিস রিদে। উকিল পুলিশের চিত্তে থাকলি কারও ছ্যানা হয় দেখিছিস?

তাও তো—। বলে হৃদয় নস্কর থেমে গেল। সে এবারে বাতাসের এক জায়গায় আশার রঙ দেখতে পেল। বাসন্তী রঙের আশা। ডিস্‌টাণ্ট সিগনালের ঠিক ওপরকার আকাশের বাতাসে। তেরছাপানা।

বজরা তখন বিলে মিস্ত্রীর খোঁজে হোলসেল দোকানে। হোলসেল দোকানী সবে ঘুম থেকে উঠে বজ্রেশ্বরকে মুখোমুখি দেখে তো তটস্থ। বিলে কোথায়?

বজরার চোখের দিকে তাকিয়ে দোকানী চমকে গেল। আমার কোন দোষ নিসনে বজরা। তোর লোক ভেবে সব টাকা পেমেণ্ট করে দিয়ে বসে আছি। যদি কিছু দরকার থাকে তো নে যা না—

টাকার জন্যি আসিনি। বিলে কোথায়?

সে আমি জানবো কি করে?

তুমি জানো ঠিক।

আমি দোকানদার লোক। দোকান নিয়ে থাকি।

তু'জনায় একসঙ্গে ফুর্তি মারছো।

কে বললে তোকে? একদিন মহকুমা সদরে গ্যালাম—তাও তো বাসে দেখা হয়ে গেল বলে—ভাল কথা বজরা। তুই বলে সৎ হবি?

বজরা মনে মনে তার বোকাহাবা দাদাটার পিণ্ডি চটকালো। বাইরে মুখখানা শান্ত করে বললো, কে বললে?

শোনা যাচ্ছে। চাঁদা উঠছে। আলিপুর গে উকিল পুলিশ ভিজোনো হবে। তোর জন্যি বড় খালাশ চায় তিন তিনখানা গাঁ।

আমি তো জানিনে।

না জানার কিছু নেই ভাই। তোমারে সৎ করে নিলি জগতে আর খারাপ থাকে কি!

বজরা গুম হয়ে গেল।

এদিকে পোড়া তুষের গুমো গন্ধে ঘর ভর্তি। আগে ঘুম

ভাঙলো সরোজপ্রভার। তার ফরসা রঙের স্বামী তখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কাঁধের দু'পাশই শুকিয়ে এসেছে। চোখের নিচে কালো কঠিন দাগ। বুকের ওপর হলদে সুজনি নেমে এসে পাঁজরার হাড় দেখা যাচ্ছিল। টেনে দিল সরোজপ্রভা। একটা পাত্র খুঁজে পেল না মানুষটা। রাধিকার জন্যে। কত লোক কত পাত্র পায়। আমরা একটা পাইনে। কচি মেয়েটার মুখ চেয়েও। মানুষটার জোতজমিও খালাশ হয়ে যেত।

রেলবাজার ঝমাঝম জমে উঠতে লাগলো। আটঘরার বিখ্যাত বাঁধাকপি বোঝাই দিয়ে চাষীরা এসে পৌঁছেছে। ব্যাপারীদের হাঁকাহাঁকি। চুনী জিলিপি খাচ্ছিল। এমন সময় সরকার টুরিস্ট সার্ভিসের বাস নিয়ে জগন্নাথ বাজারের সামনে এসে দাঁড়ালো। ভোরবেলার মতই পরিষ্কার ধোয়াপোছা ঝকঝকে বাসখানা। গাড়ির লেজে লাল সালুর ওপর শাদা হরফে লেখা—

পুরন্দরপুর-কীর্ণাহার-কঙ্কালীতলা-বক্রেশ্বর-তারাপীঠ
ইচ্ছা মতন নামুন। ইচ্ছামতন দেখুন।
যাতায়াত একশো ত্রিশ টাকা। ছোটদের জন্য
আলাদা ব্যবস্থা
ফেমিলি হিসাবে পৃথক আলোচনায় দর ঠিক হয়
সরকারস্ টুরিস্ট সার্ভিস।

চন্দনেশ্বর জংশনের জনা বারো আর আশপাশ মিলিয়ে আরও একুশ জনকে ধরে মোটমাট বাস বোঝাই দিয়ে টিকিট বিক্রি করে ফেলেছে জগন্নাথ। রেলবাজারের পয়লা প্যাসেঞ্জার রেলেরই চেকার স্নেহময়বাবু সস্ত্রীক বক্রেশ্বর যাচ্ছেন। তাকে দিয়ে বউনি। তারপর বাস ঘুরে ঘুরে লোক তুলে বেলা আটটার ভেতর চন্দনেশ্বর ছাড়লো। ছুটি করে নিয়ে শশী পাকড়াশিও বাসে উঠেছে। সে যাবে তারাপীঠ। বাপের কর্মচারী বলে জগন্নাথ কিছু কনসেসন করেছে শশীকে।

বেলা একটায় বাস পানাগড় ছাড়ালো। এবারে দু'ধারে লাল

ফুল ফোটানো জঙ্গল। শীতের শুকনো বাতাস। পিচরাস্তাটা ধূ ধূ। মোষে টানা বড় বড় গোগাড়ি। শাল জঙ্গলের ভেতর শাদা একটা মন্দির। বাসের জানলায় বসে চোখ ফেরাতে পারছিল না শশী। বাস থেমেছিল শক্তিগড়ে। সেখানে শুকনো খাবারের সঙ্গে ল্যাংচা। পেট বোঝাই এখন। শুধু একবার চান করতে পারলে ভাল ছিল। বাস চলেছে বিজ বিজ—বিজ বিজ।

শশী পাকড়াশি এরকম কোনদিন বেরোয়নি। নতুন নতুন পালাগানের মহলা দিয়ে আসছে ফি-বছর। পঞ্চানন অপেরায় কথাও ওঠে—পালাগানের দল নিয়ে কল-শোতে সবাই মিলে বেড়িয়ে পড়বে। কিন্তু যে পালায় আসরই হয়না একবারও—তারা কি করে কল-শোর ডাক পাবে!

শশীর সব ভাল লাগছিল। সে কোনদিন এরকম বেরোয়নি। রেলের স্নেহময়বাবু আরেকজনের সঙ্গে জায়গা বদলে শশীর পাশে এসে বসলেন। কি সুন্দর ল্যাণ্ডস্কেপ—

স্নেহময়ের একথার মানে বুঝতে পারলো না শশী। কি বলছেন?

কি সুন্দর মাঠ ঘাট। ঢেউ তোলা জমি জায়গা। শাল গাছ—লালফুল!

চমৎকার। চমৎকার। আমি তো বেরোইনি চেকারদা—কোনদিন বেরোইনি—

বাসের জানলা দিয়ে তাকাতে তাকাতে স্নেহময়ের মনে পড়লো, শী মশায়ের গদিতে সে একবার একখানা কানপাশা বাঁধা দিয়েছিল। ছাড়ানোর সময় পার করে গিয়ে শুনতে হয়েছিল—ও তো শশী গালিয়ে ফেলেছে।

এই ধাড়ি মাদিমার্কা শশীর ওপর তখন খুব রাগ হয়েছিল স্নেহময়ের। সোনা গালানোর জন্যে এত তাড়া কিসের? আমরা বুঝি সব। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে এসেছিল স্নেহময়।

হাপর ওঠা নামার সঙ্গে ঠাণ্ডা গলায় শশী বলেছিল, রাগবেন না চেকারবাবু। সবটাই ব্রোঞ্জ। সোনা মোটে দেড় আনা ছিল।

মিথ্যে কথা। মোট ন'আনা সোনার কানপাশা দু'খানা—অর্ডার দিয়ে বানানো।

পাছে ভিড় জমে যায়—তাই স্নেহময় সরে এসেছিল।

এই শশীকেই সে একদিন বিনা টিকিটে ধরে ফেলে। সেদিন গাড়িতে গাড়িতে ফ্লাইং চেকার। শশীকে ছাড়াতে নগদ দশ টাকা বাষট্টি পয়সা আনাতে হয়েছিল গদি থেকে।

এখন বাসের জানলার বাইরের ছবি দু'জনকে পাশাপাশি সমান করে দিল।

বাস থামলো ইলামবাজারের আগে। বাঁকের মুখে। দূরে দেখা যাচ্ছে—বাজারের হাঁড়ি কলসীর থাক থাক গলা। টিউকল দেখে বাস-এর লোকজন নেমে পড়লো। তারপর রাস্তার গায়ের ঠাণ্ডা শালবনে যে যার মত ছড়িয়ে পড়লো। জগন্নাথের রান্নার লোকজন আধ ঘণ্টার ভেতর ভাত চাপিয়ে দিল।

শীতের দুপুর। পাখিরা দূরের মাঠে। এখন এখানে শালগাছের গা ঘিরে বুনো মাছির ভনভন। শশী পাকড়াশি একটা কাদড় দেখে তাতে সাবধানে নামলো। কতকালের জমা জল। চারদিকে পাথরের ফাটলে জল ভরে আছে। সে জল খানিকটা গায়ে দিলো মগে করে। তারপর মাথায়। গা মুছে শশী ওপরে উঠতে উঠতে ট্রানজিস্টারের গান শুনতে পেল।

কাদড় জায়গাগুলো আসলে পৃথিবী তৈরি হওয়ার সময়কার। চারদিকের মাটি হঠাৎ ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে। যত নিচে যাও—মাটি আর ঘাস কমে গিয়ে পাথরের গা বেরিয়ে পড়ছে। সেখানে কি বছর বর্ষার জল জমে। টলটলে ফর্সা জল। দু'একটা কাদড়ে পদ্মও ফোটে। তার মানে—জলের নিচে কোথাও কোথাও মাটিও আছে।

ভিজে পায়ে উপরে উঠতে উঠতে শশী থমকে গেল। চারদিকের গাছপালার ছায়া নিচের জলে। জায়গাটা খুব নির্জন। ওপরে মাটির গায়ে বসে যারা খেতে যাবার আগে গুলতানী করছে—তাদের কোন কথাই এখানে পৌঁছোয় না। শশী পরিষ্কার টের পেয়েছে—সে ছাড়াও এখানে কাছাকাছি কেউ আছে। খুব কাছে। ভীষণ কাছে।

সাবধানে সরে যাওয়ার একটা শব্দ পরিষ্কার টের পেয়েছে শশী। কাদড় জমির ওপর কাঁটাঝোপ। শশী বুঝলো—যেভাবে যে কোনো পশু বুঝতে পারে—তার শরীরটা এক্ষুনি যে কোনো আঘাতে ঢলে পড়তে পারে। কেউ কোথাও লুকিয়ে থেকে নিশ্চয় তাকেই তাগ করেছে। বাতাস কেটে কালো রঙের কি একটা জিনিস ছুটে আসছিল।

শশী বসে পড়তেই কান ঘেঁষে সেই কালো জিনিসটা জলের কাছাকাছি পাথরে গিয়ে শব্দ করে পড়লো। বাসের লোহার স্টার্টার। চমকে শশী পাকড়াশি ওপরে তাকালো। এখন আর কোন আড়াল নেই—।

শশী হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। আমায় মেরোনি দাদাবাবু। আমি কি করিছি?

সে-কান্নায় জগন্নাথ একটুও টললো না। নান্তু শী-র ছেলে জগা দরকার এখন রিং থেকে পিটিয়ে টায়ার খোলার হাতুড়ি হাতে ধুপ ধুপ করে নেমে আসছে।

নামতে নামতেই জগা বললো দাঁতে দাঁত চেপে—কি করোনি? আমিও তোমায় পাবো বলে তক্কে তক্কে ছিলুম।

হাতুড়ি হাতে জগন্নাথ পাথর আর কাঁটাঝোপ টপকে টপকে নামছিল। কাদড়ের ওপরকার আকাশে একটা ছ'টো পাখি। তাতে মেঘ ঘষা ঠাণ্ডা বাতাস। শশী বুঝলো, আজ আমার জীবনের শেষ দিন। নয়তো কিছু জানতে না দিয়ে কেউ পয়লাবারেই বাসের স্টার্টার তাগ করে ছুঁড়ে মারে?

কি করেছো! কি করোনি?

এ শাসানিতে একদম কুঁকড়ে গেল শশী। সে ঠাণ্ডা পাথরের ওপর জবুথবু হয়ে বসে পড়লো। এখন তার কান্নার আর কোন শব্দ নেই। মুখের ভেতরটা শুকিয়ে আসছিল। বাসের জানলায় বসে যে জঙ্গলকে মনে হয়েছিল—চমৎকার!—তাই এখন মনে হোল মারাত্মক। কেন এলাম? না এলেও তো চলতো আমার—

রাধিকের বিয়ে হচ্ছে না কেন? আমি জানিনে—

আমার কি দোষ—

মাছ ধরতে ঝাঁপিয়ে জলে নামা! সব আমি শুনিছি—।

জগা সরকার নেমে এসেই হাতুড়িসুদ্ধ হাত তুললো। সঙ্গে সঙ্গে শশী পাথরে বসা অবস্থাতেই তার পা জড়িয়ে ধরে বুকের ভেতর থেকে কেঁদে উঠলো। কাঁদতে কাঁদতেই শশী দেখলো, একটা অন্যমনস্ক কাঠবেড়াল চমকে গিয়ে তার দিকে তাকিয়েছে। আর অমনি সে টের পেল—তার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে অনেকটা অন্ধকার খচ করে শরীরে ঢুকে যাচ্ছে। বুঝলো, এখন আর আটকানো যাবে না।

জগা ততক্ষণে আরেকবার হাতুড়িটা তুলেছে। পায়ের সঙ্গে একটা ভারি মানুষ লেপ্টে গেছে। এ অবস্থায় পুরো দম নিয়ে হাতুড়ি তোলা যায় না। যে পাত্তর আসবে—তাকেই রাধিকে বিদেয় দেবে—

শশী বলতে চাচ্ছিল, সে দায় আমার না দাদাবাবু। আমার না—

কিন্তু কথাগুলো বেরিয়ে এলো জলে ডোবা মানুষের গলায়। একদম দলাপাকানো। ওরই ভেতর শশী একবার বলতে পারলো—রঘু। তারপর শোনা গেল—কিছু বু বু বু ব—। শশীর মাথার ভেতর তখন কচুবন থেকে মরা মাছগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছিল।

আসলে শশী বলছিল, রঘুবাবু যে আসেন—

হাতুড়িটা ভিজে গেল। তবু থামলো না জগা। তার নিজেরই ঠোঁটে দাঁত কেটে বসছিল। আবার রঘুর কথা আসে কোথেকে?

এবারে হাতুড়িসুদ্ধ জগার হাত নিচে নেমে আর উঠলো না। শশী পাকড়াশি তখন তার নিজের ভেতর তলিয়ে যেতে যেতে মনে করার চেষ্টা করল, রঘুবাবু তো সজনেতলা দিয়ে নিয়মিত আসেন।

সরকার টুরিস্ট সার্ভিসের জগন্নাথ সরকার ওরফে জগা শী এইমাত্র বিড় বিড় করে বলে ফেললো, এ আমি কি করলাম। আর বলতে পারলো না কিছু। এখন সামনে তাকে অনেকটা খাড়াই ভেঙে কাদড় টপকাতে হবে। তারপর ঘাসে ঢাকা মাটি। বাসের লোকজন সবাই খেতে বসবে একটু পরেই। মাথার ওপর অনেকটা জুড়ে মেঘে ঘষা ঠাণ্ডা আকাশ।'

বেশি রাতের প্ল্যাটফর্মে মাঘ ফুরোনো বাতাস। এখন আর সকালের আগে কোন গাড়ি নেই। চুনী তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে খেতে বসেছে। দেওয়ানের পুরনো একটি হাফপ্যান্টের একটা দিক চুনীর গলা দিয়ে গলানো—দিব্যি ওভারকোটের কায়দায় গায়ে খাপ খেয়ে গেছে। দেওয়ান যাচাই করে টেংরির ডালনা দিচ্ছিল। রেলের আলোয় রীতিমত নেমন্তন্ন পার্টি।

সাইকেল রিকশোয় পাঁচটি মিনিট এগিয়ে নাড়ু শী বাড়ির সামনে নামলো। শশী বেড়াতে-গেছে বলে একা একাই নাড়ু গদি খোলে। গদি তোলে। বাড়ি ফিরে দেখলো, একতলায় আলো জ্বলছে। কিন্তু দোতলাটি অন্ধকার।

নিচের ঘেরা বারান্দায় পাম্প-সু খুলে নাড়ু পা টিপে টিপে দোতলায় উঠলো। লাবণ্য কোথায় গেল? রাধিকে? এইসব ভাবতে ভাবতে ঘেরা বারান্দায় এসে দেখলো, দিব্যি একটি হ্যারিকেন জ্বলছে। আলোর অনেকটাই ঢাকা দেওয়া।

কি ব্যাপার ?

নাড়ুকে দেখে লাবণ্য বললো, চুপ।

কিসের চুপ ? কি ব্যাপার বলতো। অন্ধকারে বসে আছো। নতুন খোকাকে তো মশায় ধরবে।

না। আমার কোলে।

রাধিকে কোথায় ?

ওই তো জানলায়। তুমি এখন নিচি যাওতো। শ্বশুরকে দেখলি কোন জামাই আসে।

নাড়ু ক্ষেপে গিয়েও বিশেষ কিছু বলতে পারলো না। রাগে রাগে বললো, এসব বিশ্বেস করো ? মরে গিয়ে মানুষ ফেরে কখনো ! এই রাধিকে —

রাধিকে এগিয়ে এলো। অন্ধকারেও মেয়ের শাড়ির জরিপাড় হ্যারিকেনের আলোয় ঝকমক করে উঠলো। একদম সধবার বেশ বলে রাধিকা পুরোপুরি আলোর সামনে আসতে পারছিল না। একটু পরেই খোকার বাবা রঘুবাবু আসবেন। দ্বিরাগমনের সেই ধুতি পাঞ্জাবী পরে। আবছামত সজনেতলা দিয়ে। বড় করে খোঁপা বেঁধেছে রাধিকা।

নাড়ু কিছু বলতে পারলো না। তার ফতুয়ার নিচের বুকখানার খানিক জায়গা এই মাত্র পাথুরে হয়ে গেল।

রাধিকা যেমন এসেছিল—তেমনি ছুটে গেল। জানলায়। ওই ছাখো বাবা। ওইতো।

নাড়ু শী এগিয়ে গেল জানলায়। তার ভয়ের চেয়ে দুঃখ হচ্ছিল বেশি। মাঘ ফুরিয়ে যায় যায়। সজনে গাছের ছায়া ছড়ানো ডালপালা বুনোলতা সমেত সামান্য দুলে উঠলো। এখনো দখিনা বাতাস বইতে অনেক দেরি। নাড়ু চোখ বড় করে তাকালো।

ওই ছাখো বাবা—

নাড়ু অবাক হোল। সত্যিই তো ধুতি পাঞ্জাবী পরে কে

আসছে। ছায়ার বাইরে চেহারাটা বেরিয়ে পুকুরধার ধরে এগিয়ে আসতেই নাছুর গা শিউরে উঠলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নাছু হো হো করে হেসে উঠলো। ও তো আমাদের শশী।

ভালো করে ত্মাখ বাবা।

দেখেছি। ওই তো আমাদের শশী। সেজেগুজে যাচ্ছে কোথায়? জগার বাসে গিয়েছিল না লাবু?

লাবণ্য কোন জবাব দিল না। সে হ্যারিকেনের পাশে কচি নাতি কোলে বসেছিল। নাছু কিছু বিশ্বাস না করে হাসছে দেখে লাবণ্য মহা বিরক্ত।

নাছু আবার বললো, হয়তো মাঝপথে নেমে গিয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু গদিতে এলো না কেন? বলতে বলতে নাছু শী নিচে গেল। খালি পায়ে।

লাবণ্য ডাকলো। ও রাধিকে।

রাধিকা কোন জবাব দিল না। সে নিজেও দেখেছে। সত্যিই শশী। রঘুর আসবার সময়টায় কোত্থেকে এসে হাজির হোল? তাও একদম্ একই পোশাকে। আশ্চর্য! দ্বিরাগমনের ধুতি পাঞ্জাবি কোথায় পেল শশী? জায়গাটা সজনের ডালে এমনিতেই আবছায়া। তার ওপর বাতাস দেওয়ায় গাছ বেয়ে ওঠা বুনো লতাও দুলছিল। রাধিকা লক্ষ্য করেছে—চাঁদের গা ঘিরে কেমন একটা জংলা ভাব এসে যাচ্ছে। এই ক'দিন হোল।

নিচে নেমে আর শশীকে পেল না নাছু। কোনদিকে গেল? এদিকে এলো তো এখানে এলো না কেন? মাঝপথে বাস খারাপ হয়নি তো? হয়তো জগার কথা মত মেকানিক নিয়ে যেতে এসেছে। পুকুরঘাট অব্দি গিয়ে ফিরে আসছিল নাছু। যাক কাল ভোরেই শশীর মুখে সব শোনা যাবে।

ফেরা হোল না নাছুর। ঘেরানো ঘাট বাঁধানো পুকুর। অন্ধকারের ভেতর, সাত আটজন লোক নিয়ে প্রথম যে এগিয়ে

এল—সে ভগবান মোড়ল। একতলার ছড়িয়ে পড়া আলোর খানিকটা ঘাটেও পড়েছে। তার ভেতর ফতুয়া গায়ে এগিয়ে এলো ভগবান প্রথম।

জংশন চন্দনেশ্বরে লোকে চল্লিশ পঞ্চাশ পেরোলে একে অন্যকে দাদা বলে ডাকে।

ভগবানও তাই ডাকলো। নাহুদা, তুমিই ঠিক করে দাও।

বাকি সবাই তখনো অন্ধকার থেকে বেরোয় নি। দোতলার জানলায় জরিপাড় শাড়ি পরে সধবার বেশে দাঁড়ানো রাধিকা। রঘুর জায়গায় শশী। যাওবা এলো—মিলিয়ে গেল কোথায়! কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে নাহু শীর ভাবনা চিন্তা—সুখ দুঃখ একদম গুলিয়ে গেল। তাই সে খিটকেল গলায় চেঁচিয়ে বললো, সারাদিন পরে এখন থামোতো ভগবানদা। এটা সালিশের সময়?

অন্ধকার থেকে হাফ-ল্যাংচানো অবস্থায় হৃদয় এসে আলোয় দাঁড়ালো। বাঁধানো সিমেন্টের বেঞ্চে বসে নিয়ে বললো, আপনিই ছাখেন না কেন—আপনার কথা তো শোনে বজরা—

আলো অন্ধকারে ধাতস্থ হয়ে আসছিল নাহু। কি ব্যাপার বলবি তো রিদে?

আপনারে বললি আপনি বোঝবেন কথাটা। আপনি চন্দনেশ্বর জংশন—রেলবাজারের একজন মাথা—

হৃদয় নস্করের কথায় অন্ধকারে কয়েকজন মাথা নেড়ে সায় দিল।

আসল কথাটা বলে দে রিদে। তুই হোস গে আমাদের বজ্রেশ্বরের মায়ের পেটের বড় ভাই। বলনা কি কথা?

আপনি ওই বজ্রেশ্বরকেই বলুন না কেন। কথাটা কি ও-ই বলুক।

ওঃ! সে গুণধর এখানে। কোথায়? বেরিয়ে আয় তো দেখি একবার। কতদিন দেখিনে তোরে—

লাজুক মুখে বজ্রেশ্বর নস্কর এগিয়ে এসে আলো আঁধারিতে দেখা দিল। মাথা নামানো।

এই শীতে খালি গা কেন বাবা? বলেই নাহু বজ্রেশ্বরের পিঠে আদরের হাত বোলালো। কোথায় কোথায় থাকিস? দেখিনে যে আর—

বজ্রেশ্বর কোন কথা বলতে পারছিল না। ভাঙা কথায় বললো, ছ্যাখেন না কেন। কীরকম পাগলামি। বসেছিলাম রাখাল গাজির দোকানের সামনে—

ভগবান মোড়ল এগিয়ে এসে বললো, আমি বলি নাহুদা—

নাহু ধমকে উঠলো। একসঙ্গে সবাই কথা বলিসনে। কি হয়েছে বজরা? আবার কি গোলমাল করছিস?

কোন গোলমাল পাকাই নি শী-মশাই। কী পাগলামি বলেন তো দাদার—

হৃদয় ভেঙিয়ে উঠলো। হ্যাঁ। পাগলামি। পুলিশের গুলি খেয়ে মরা পাখির ধারা পড়ে থাকবি। ভূঁই ছেড়ে আর উড়তি হবে না কোনদিন—

ভগবান এই বলে শুরু করে দিল, আমরা তিনখানা গাঁ মিলে—

বজরা নিজেই বললো, আমায় নাকি ভালো হতি হবে শী-মশায়—

কি? তারপর থতমত খেয়েই নাহু বললো, বজ্রেশ্বর তো আমাদের খুব ভালো ছেলে। ভয়ডর নেই। সাহসী।

হৃদয় নস্কর চেঁচিয়ে উঠলো, সে-কথাই তো বলতি চাই। আপনি ঠিক করে দেন।

নাহু ঠিক আন্দাজ পাচ্ছিল না—ব্যাপারটা আসলে কি। তাই আন্দাজে আন্দাজেই বজরার প্রশংসা চালু রাখলো মুখে। দেখেশুনে হামলা করে। বজরার নামে কেউ বলতি পারবে না—সে চেনাজানা বাড়িতি চড়াও হয় রাত বিরেতে—

এবার ভগবান মোড়ল না থেমে একদমে বললো, আমরা ওরে ভাল করতি চাই।

এবারো নাহু শী কিছু বুঝতে না পেরেই আন্দাজে বললো, সে তো খুবই ভালো কথা। এর মধ্যি মন্দ কথা তো কিছু নেই। তোমরা পাঁচজন যা ঠিক করবে—

আঃ! বলে চেঁচিয়ে উঠলো বজরা। আমি তো ভালোই আছি শী-মশাই। আপনি তো আবার গুলিয়ে দিচ্ছো।

বজরার ধমক খেয়ে নাহু শীর সব একদম গুলিয়ে গেল। সে নিজে গিয়ে হৃদয় নস্করের পাশে সিমেন্টের বেঞ্চে বসে পড়লো। খুলে বলতো।

আমি আবার খারাপ কবে!

সে তো ঠিক কথাই বজরা। বলেই নাহুর মনে পড়লো, গত সনে ঠিক এই মাসে বজরা নিশুতি রাতে এসে তাকে ঘুম থেকে তুলেছিল। সাড়ে তিন ভরির মটরমালা। গালানোর পর তার সব টাকা এখনো বজরাকে দেওয়া হয় নি। তুই তো খুব ভালো ছেলে। রেলবাজারের কোন ঝুটঝামেলিতে থাকিসনে।

এবারে ভগবান মোড়লের পালা। সে বললো, নাহুদা, কথাটা ভালো করে শোন। আমরা তিন গাঁ মিলি প্রায় চারশো ট্যাকা তুলিছি।

টিউকল বসাবা ভগবানদা?

আজ তোমার কি হল বলতো? মাথাটা কোনদিকি? মনটা কোথায়?

তা বটে। বয়স হচ্ছে তো ভগবানদা।

আমার বয়স হয়নি? কথাটা ভালো করে শোন। আমরা বজরাকে সৎ করে নেব। খরচাপাতি যা লাগে—একদম সৎ বানায়ে নেব। উকিল পুলিশ যারে যেভাবে ভিজোতে হয় ভিজোবো। গাঁয়ের একটা বল ভরসা বজরা। ওরে আমরা বেঘোরে মরতি দিতি পারি?

কক্ষনো না। কিন্তু—

গুলিয়ে যাওয়া নাহুর দিকে তাকিয়ে বজরা হো হো করে হেসে বললো, ভাবেন শী-মশাই কথাটা একবার। সবার কাছে আমারে ভালো করে দেবে! জজের কাছে ভালো। যেখানে চড়াও হই রাত বিরেতে—সেখানেও ভাল। ভালোর চেয়ে ভাল! আরও কত ভালো। পাগলামি কি না বলেন?

খানিক অন্ধকার—খানিক আলোয় সবাই চুপ করে নাহুর মুখে তাকালো। এবার নাহুর রায় দেওয়ার পালা। সে গদিতে বসে সারা জংশনের লোক চরায়। তার পক্ষে বেশিক্ষণ চুপ করে থাকাও মানায় না।

একটা মুস্কিল আছে রিদে। তোর ভাবনাটা ভালো। কিন্তুক ছুনিয়াটারে কি ফের সত্যযুগে নিয়ে যেতি পারিস?

তুমি একটি গুলোঞ্চ মানুষ। সব গুলিয়ে দিলি তোমারই লাভ।

নাহু এর কোন জবাব দেবার আগেই বেশ সমঝদারী গলায় বজরা বললো, আমি তো কিছু খারাপ নই ভগবানদা। আমি তো ভালোই। সৎ তো চিরকাল আমি। ভাগ-বাটোয়ারা সর্বদা সমান সমান করি।

হৃদয় ধমকে উঠলো। চুপ কর। যা বুঝিসনে তা নিয়ে কথা কেন?

বজরা না দমেই বললো, কোর্ট কাছারিতে পয়সা লাগে। বাবুদের পান খাওয়ার পয়সা—টাইপ করানোর পয়সা—উঠতি পয়সা—বসতি পয়সা। জিরেন নেই কোন। চাঁদা তুলিছো তো ভাল কথা। ট্যাকাগুলো দাও। মামলাগুলোর এট্টা এট্টা করে গতি করি।

তাতে কি তুই সৎ হবি?

ভালো জ্বালা। চিরকাল আমি সৎ। আমাদের গাঁয়ের কাউকে ঠগাই বলতি পারো? মিথ্যে বলি?

হৃদয়ের কান্না পাচ্ছিল। কেন যে সহজ কথাটা বুঝতে চায় না বজরা। এবারে সে খোলসা করে বললো, ওই টাকায় কি তোরে হুজুরের সামনে দাঁড়ায়ে সব সত্যি কথা বলতি দেবে?

বলি আর কি! সারাটা জীবন তাহলি হাজতে থাকতি হবে। যা বোঝো না—তা নিয়ে কথা কেন?

হৃদয় বললো, তবে কি? ট্যাকাও যাবে? মিথ্যেও বলতি হবে? খরচাপাতি যদি আরেকটু বাড়াই—তাহলিও সত্যি বলে নির্ঝঞ্ঝাট হওয়া যায় না?

কেন কথা বাড়াও। টাকা হাতে আছে যখন—এই শীতে খালের উপর একটা পুল বসাও। সারা গাঁয়ের কাজে দেবে। নয়তো বর্ষায় গরু মানুষ সবাই ডুবে ডুবে পার হতি হবে। আমার জন্যি ভেবো না। আমি তো চিরটা কাল সৎ।

নাদুর মাথায় এখন সব পরিষ্কার। কলকাতার এত কাছে এতগুলো হাবা একসঙ্গে আছে কি করে। সে জানে, বজরা এখন গিয়ে কোর্টে সত্যি কথা কবুল করলে নির্ঘাৎ চোদ্দ বছর। একাজ জেনে শুনে কেউ করে? আদালতে জালমানষির দাম দিতে দিতে বজরার পিঠের চামড়া উঠে যাবে জেলখানায়।

রাত এগিয়ে গেছে অনেকটা। রেলবাজার ঘুমোচ্ছিল। নাদু শী উঠে যাবার আগে বললো, হ্যাঁরে রিদে। তুই কি ফের তোর বালকবয়সে যেতি পারিস?

তোমার কঠিন কথাগুলো এখন রাখো তো নাদুদা। পারো তো বজরারে বিঘে তিনেক জমি দাও ভাগে। ওরে আমরা গৃহস্থি করে নেব। সৎ করে ফ্যালবো।

তিন কেন? সাত বিঘে চাষ করুক না কেন। কিন্তু ও কি চাষে মন দিতি পারবে?

দিতিই হবে নাদুদা। চোখের সামনে একটা মানুষ শেষ হয়ে

যাচ্ছে। আর আমরা সবাই টিকিট হাতে বজরার বায়োস্কোপ দেখে যাচ্ছি। এমন চলতি দেওয়া যায় নাহুদা?

নাহু শী কোন কথা বলতে পারলো না। জংশন চন্দনেশ্বরের কাছাকাছি সবচেয়ে বড় হাবা এই ভগবানদা। বিরাট কেঠো চেহারাখানা পুজোর বলির খাঁড়া করে ঘুরে বেড়ায়। কোন আড়াল নেই। নাহু আর কথা বাড়াতে চায় না। যাই শুয়ে পড়িগে—তোমরাও খরো খরো পায়ে এগোও।

সাত

নিশুতি রাতের রেলবাজারে চন্দনেশ্বর জংশন মরে পড়ে ছিল। আধখানা হাফপ্যান্টের কোট গায়ে চুনীও ঘুমোচ্ছিল। ভরপেটের ঘুম বলে টেরও পেল না—বজরা ফাঁকা প্লাটফর্মে উঠে হেঁটে যাচ্ছে। রেললাইনের সামনের উজানে বাঁক নিলেই বাঁশড়ার সেই বিখ্যাত বাঁশবন। ফাঁপা রেলপোলের স্লিপার। তাদের জায়গায় জায়গায় মালগাড়ির ইঞ্জিন জ্বলন্ত কয়লা ফেলে দগ্ধে রেখেছে। তার নিচে নদীর শুখো বুক। বড দানার বালি। বাতাসে বড় বড় ঘাস দোলে। বড় খুড়ো, মেজো খুড়োর গা দিয়ে এককালের ক্ষ্যাপা নদীর ঘ্রাণ। সে ঘাস বাতাসেও থাকে। বালক বয়সে রাখালীর সময় গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে চরাতো। তখন বজরা এক একদিন বড় খুড়োতে বসে মেজোখুড়োতে মাথা পেতে ঘুমিয়েছে। পাথরের গা থেকে নদীর ঘ্রাণ উঠে এসে তাকে সময়মত জাগিয়ে দিতো। বলো। কি বলতি চাও?

প্লাটফর্মের শেষ মুড়োয় এসে অন্ধকারের ভেতর সেই চেনা গলা শুনতে পেল বজরা। আর এগোনো হোল না তার। বড় ভাই বড় অবুঝ। কোত্থেকে যে সং বানাবার পাগলামো ঢুকলো তার মাথায়! বজরা বুঝতে পারে—হৃদয় নস্করের বুকের ভেতর একজন

বড় পাখি বসে আছে। ঝড় উঠলে বড় পাখি তার ডানা দিয়ে ছ্যানাপোনা আড়াল করে। বাবার হাতে পত্তন এ ঘরবাড়ির। বসতি ঘিরে যা কিছু ফলবান বৃক্ষ সবই বাবার নিজির হাতে বসানো। এই ঘর—এই গাছপালা—সব কিছুতে বড় ভাইয়ের মায়া বড়। নারকেল গাছে কাঠঠোকরা পাখি ঠোঁট ঠুকতে বসলে —বড়ভাই ঢিল ছোঁড়ে। পাছে গাছের গা নষ্ট হয়। তার ওপর হৃদয় নিজেই বলে, নারকেল গাছে গত পেলি গোখরো বাসা বাঁধে। এই ধারার কথা বাবা বলতো। বজরা শুনেছে বাবার মুখে। বড়ভাই মনে মনে সেসব কথা মুখস্থ করে রেখেছে। সময়মত ছাড়ে।

বলো। কি বলতি চাও? আবার বড় খুড়োর গলা। ধমকের সুরে। বল—

বজ্রেশ্বর থমকে দাঁড়ালো। রেলগেটের কাছাকাছি জুতোর দোকানটার সামনের ঝাঁপ বন্ধ। কিন্তু পেছন থেকে সমান তালে কি একটা অনবরত পড়ে যাচ্ছে। বজরা পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। যা ভেবেছি তাই।

অন্ধকারে একটা লোক কালো মত কি একটা তুললো।

থাম থাম। বলে চেপে হাসলো বজরা। তাই ভাবি! কে এমন ডাকাবুকো? ঝাঁপ বন্ধ না হতিই রাজসাক্ষীর এ কি ব্যাভার!

পালান মিস্ত্রী হাতের শাবলখানা তুলেছিল। জংশন চন্দনেশ্বরের সদর রাস্তায় এখন মাঘের শেষের হাড় কাঁপানো শীত। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতে পালান গলা অব্দি চাদরখানা বেঁধে নিয়ে মাটি খুঁড়তে বসেছে। খের চুন দিয়ে গাঁথা লাখগঞ্জের ইঁট। দোকানের পেছন দিকটার মাটি খুঁড়ে ইঁটে কিছুক্ষণ ঠুকলেই খুলে আসবে। জায়গাটা আদাড়ে—আর দুর্গন্ধ। দাঁড়ানো যায় না। নাক অব্দি কম্ফর্টার দিয়ে পালানের মুখ বাঁধা। পাছে কেউ টর্চ ফেলে এক ঝলকে চিনে নেয়। তারই ভেতর পালান বললো, তোমার শিকিরি নাক। তোমারে কে ঠগায়—

রাস্তা থেকে তোর মাটি ফেলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

মুখের বাঁধনটা আরেকটু আলগা দিয়ে দিল পালান। একা লোক তো। হাতের তালটা ঠিক ছিলো না।

এখনো চন্দনেশ্বর ঘুমোয়নি পালান। ধরা পড়ে যাবি।

তুই আয় না। একসঙ্গে খুঁড়ি পালা করে।

তুই না রাজসাক্ষী? পুলিশের পাহারায় কোর্টে আসিস—

সে তো যখন শহর আলিপুরে থাকি। তুই আয় না বজরা—একসঙ্গে খুঁড়ি। আজই সন্ধ্যেবেলা অনেক জুতো দ্যাখলাম দোকানে।

তুই আর আমি জুতোর কি বুঝিরে পালান! পায়ে পরিছি কখনো?

আস্তে কথা বল। জুতোর মর্ম না বুঝি—বেচতি তো পারবো।

এখন যদি তোরে ধরায়ে দি। তাহলি রাজসাক্ষীর দশাটা—বলেই ঠা ঠা করে হেসে উঠলো বজরা।

তাতে সিঁটিয়ে গিয়ে পালান মিস্ত্রী বললো, থাম! থাম। তুই তো হেসে হেসেই লোক জড়ো করবি। আয় না—একসঙ্গে খুঁড়ি।

নাঃ। আমি যাই পালান। মালগাড়িটা আসবে এখন—

কোনটা?

আধো অন্ধকারে শাবল হাতে পালান মিস্ত্রী। দোকানের পেছনের আদাড়ে দাঁড়ানো। রাত্তির একটা দেড়টা হবে। আকাশ থেকে মাটি অব্দি ঠাসা শীত শুধু। তার ভেতর ঝাঁপ বন্ধ দোকান-পাট। মরা রাস্তা। হিম মাখানো কঠিন দু'টো রেলের পাটি। সামনে তাকালে অন্ধকারে দাগানো রেলের লাল রক্তচক্ষু। যে মালগাড়ি তোরে আর আমারে আলাদা করে দিল পালান!

শাবলসুদ্ধ চুপ করে গেল পালান মিস্ত্রী। রাজসাক্ষী না হলি হাড় চুর চুর করে দিত হাজতে। আমার আর রাস্তা ছিল না। বিশ্বেস কর বজরা—

যাবার জন্যে এগিয়েছিল বজ্রেশ্বর। ঠাণ্ডা রেলপাটিতে দাঁড়িয়ে বললো, ভাগ দিবি কেন? তুই শুরু করলি। তুই শেষ কর না—

একা পারবো না বজরা। তুই আয়। মালগাড়িটা আসার ঘণ্টা দেবে—চলে আয়। এই মালগাড়িটাই সব্বোনেশে। দ্যাখ না পালান—তোর সহোদর বাতি ধরে এ গাড়ি আটকালো। কিন্তু তারপরই? আমরা আলাদা হলাম। ভাগ হলাম। আর দেখা দেয় না। কথা বলতি চায় না আমার সঙ্গে।

চিনি বিক্রির কাঁচা পয়সা যে হাতে। আসবে কি করে? নে আয়। হাত লাগাবি। আমি ততক্ষণ এট্টা বিড়ি ধরাই বজরা। যা শীত—উঃ।

এবার বাদ দে আমারে। আমি ভালো হয়ে যাচ্ছি।

বিড়ি বের করেছিল পালান। ধরানো হোল না। অন্ধকারে তার চোখ একবার চমকে উঠলো। হু। এরকম কী একটা কথা গাবতলায় বলাবলি হচ্ছিল। তোরে নাকি ভালো করে ফেলা হবে। সত্যি?

তাইতো শুনতি পাই। ভাবিসনে পালান। আমি আবার ফিরে আসবো। দেখিস—

ওকি অলুক্ষণে কথা বজরা? যাবি কোথায়? আমরা ন্যাংটো-বয়স থে একসঙ্গে বড় হলাম। চুরি শেখলাম। ডাকাতি করলাম। এসব ফেলে কোথায় যাবো! তুই-ই বা যাবি কোথায় পাগল?

আমারে সৎ করে নিচ্ছে বড় ভাই। তিনখানা গাঁ মিলে প্যালা তুলিছে।

ট্যাকাটা গাপ করে চলে আয় বজরা। ফিরে আয়—

ট্যাকা তো লাগবেই। ট্যাকা ছাড়া মামলার সুপারিশ চলে? বারোখানা ডাকাতির মামলা—কম কথা পালান।

ভাল করে ফেলার এসব বদ বুদ্ধি কে দেয় তোরে? সেই বড়ভাইটা তোর—তাই না?

হ্যাঁ। আমরা কবে আবার খারাপ ছেলাম। কবেই বা খারাপ হলাম! জানিনে তো পালান। আমরা তো চিরডাকালই ভাল।

তাই তো জানি বজরা। বড় ভাইখানার মাথাডা ছু'ফালা করে দিবি এই শাবল দিয়ে?

ইচ্ছে তো করে। এমন হাবা—কি বলবো তোরে। এমন একখানা একখানা কথা নামায় না! সৎ করে নেবে? আর ওই কথা নে ভাবতি বসো। সব কাজ বানচাল। বড় কাজের সব ইচ্ছে নষ্ট। মনের মধ্যি দোনামনা ভাব ঢুকে যায় শেষে। খারাপ? না ভালো? ভালো? না খারাপ? এ দশা হলি কোন কাজে নামা যায় বল পালান?

যাচ্ছিস কোথায়? আয়। একসঙ্গে হাত লাগাই। কতক্ষণ আর লাগবে।

বজরা চলেই আসছিল। লাইন টপকাতে গিয়ে দেখলো, অন্ধকারে একটা হেডলাইট। এ আলো তার চেনা। সেই মালগাড়িটা আসছে।

বজরা থমকে দাঁড়ালো। পালান মিস্ত্রী বললো, আয়। চলে আয়। গাড়ি এসে গেল।

নারে পালান। থাক আজ। সেই তো আবার মালগাড়ি আমাদের আলাদা করে দেবে। তোর সহোদর।

চললি?

যাইরে। আবার তো আলিপুরি দেখা হবে। আরেক-খানা কোর্টের কাগজ আসিছে—বিলের দশাও তো নিজির চোখে দেখলি!

তো এই থন্তাটা নে যা। রিদে নস্করের মাথা ছু'ফাঁক করাবি নি?

বজরা লাফিয়ে লাইন টপকালো। মালগাড়ি এসে পড়েছে। পালান মিস্ত্রী আদাড় ঘেষটে জুতোর দোকানের আরেক আড়ালে

গিয়ে দাঁড়ালো। কেউ যাতে দেখতে না পায় সেইজন্যে। এখন এখানে কিছুক্ষণ তাকে থাকতে হবে। বিড় বিড় করে তখন পালানের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল একই কথা। যত্ত সব কাজে কম্মে বাগড়া দেওয়া কথাবার্তা—বজরার মত এট্টা ভালো ছেলে বিগড়ে যাচ্ছে?—উঃ! মালগাড়ির আওয়াজ, ধোঁয়া আর পালান মিস্ত্রীর শোক, আফশোষ সব একসঙ্গে মিশে গেল। কারণ শীত একা সবই একসঙ্গে থেতলে দিচ্ছিল।

৺খগেন নস্কর ঘর তুলেছিল ধানক্ষেতে। পুকুর কেটে। পাঁক মাটিতে ছনঘাস কুচো করে মিশিয়ে মিশিয়ে দেওয়াল গাঁথা। পুকুরপাড় ধরে নারকেল সুপুরি তারই হাতে বসানো। তার পরেই ধানকাটা মাঠ। ঘরের কাছাকাছি এসে বজ্রেশ্বর থমকে দাঁড়ালো। নারকেল সুপুরির ঝোল বরাবর কানাৎ ঘেষে একটা বিড়ির আগুন ওঠা নামা করছে।

ঘোর আঁধারেও নিজের মুখের হাসি দেখতে পেল বজরা। পুকুরে কাঁটা ভর্তি বাবলা ডালের পালা ডোবানো আছে। নিজে নামুক—কি জাল ফেলুক—একদম অষ্টরম্ভা। তার নিজের হাতে ছাড়া মাছ গোয়ালের জোল ধোয়া জল খেয়ে খেয়ে এখন বাড়ন্ত বয়সের চেহারা নিচ্ছে। বোঝা যাবে সেই শ্রাবণ মাসে। এখন নড়াচড়া দিলে শুধু লেজের ঘাই মারবে জলে। কিন্তু ধরা দেবে না।

বজরা বিড়ির আগুন লক্ষ্য করে একটা বড় ঢেলা তাগ করে ছুঁড়লো। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় নস্করের গলা, কে রে?

তুমি? তুমি এখন? ওখানে কি? বলতে বলতে বজরা ছুটে এলো। মনে মনে বললো, গায়ে লাগেনি তো বড়ভাই? কিন্তু একথা এখন মুখে আনা যায় না।

অভ্যেস তো নেই এখন। সেইতো লেংচে লেংচে এ'কমাস চলে ফিরে বেড়াই—

কি অভ্যেস গো? সঙ্গে সঙ্গে বজরা নিজের মনের ভেতরে বললো, শুধু আমার জন্যি—আমার জন্যি—

এই গ্যাখলাম ধানের গোছা ধরে কাটতি পারি কিনা—

ফাঁকা মাঠে হো হো করে হেসে উঠলো বজরা। মাঘ মাসে উদোম মাঠে কিসির গোছা ধরে তুমি কাটবা বড়ভাই!

অন্ধকারে হাতের কাস্তেখানা তুলে হৃদয় নস্কর বললো, ধান নেই—ধানের গোছ নেই এখন মাঠে—তা জানিরে বজরা—

তবে?

উবু হয়ে বসে গ্যাখলাম—আগের মত উঁচু হতি পারি কিনা? বাঁ হাত গোছ করে ধরতি পারি কিনা? ডান হাতে কাস্তে সাপটে—

মাঝখানে বাধা দিয়ে বজরা বললো, যে-ধান নেই তার গোছ ধরে?

ভেবে নিলাম আছে। বাকি কাজগুলো আমারে দিয়ে আর হবে কি না গ্যাখলাম। আমরা তো চাষী ফেমিলি বজরা। সে অভ্যেসটা ভুলে গেলি—হারালি—কোথায় গে দাঁড়াবো?

তাই বলে এই নিশুতি রাত্তিরে বড়ভাই?

দিনি দিনি লোকজন চলাচল করে। কে গ্যাখবে—আর রেল-বাজারে গে রটাবে ৺খগেন নস্করের বড় বেটা ফাঁকা মাঠে মাঘ মাসে ধান কাটতিছে।—অমনি সবাই বলবে—পাগলা রিদে—। তাই—। কিন্তু ভুললি চলবে না—আমরা আসলে কি?

কি আমরা?

আমরা হলাম গে চাষী ফেমিলি। আমরা ডাকাইতিতে নেই বজরা। কোনদিন ছেলাম না—ও বিত্তি আমাগে না।

ধমকে উঠলো বজরা। কে বললো তোমারে—আমি ডাকাইত? তুমি দেখিছো?

না। তবে সবাই ডরায় তোরে।

আমার গায়ে নেখা আছে—আমি ডাকাইত ?

কোর্টে তো তোর বারোখানা ডাকাইতির মামলা বজরা।

একটাও তো প্রেমাণ হয়নি এখনো।

অন্ধকার খুঁড়ে হৃদয় তার ছোট ভাইয়ের চোখে তাকালো। সে চোখে এখন দুই আধুলির পারা গোল গোল আঁধার। বজরার হাতে ডাণ্ডা মত কিছু বোধ হয়।

যত এগোচ্ছিল বজরা—ততই তার মাথার ভেতর পালান মিস্ত্রীর কথাটা আছাড় খাচ্ছিল। সে বড়ভাইয়ের মাথা দু'ফাঁক করে। যত্ত কাজকম্ম বেগরানো কথাবার্তা···। যে কথায় মন দোনামনা হয়—সে কথায় বজরার সারা শরীর চিড়বিড় করে। আমারে সৎ করে নেওয়ার মজা দেখাচ্ছি। আমার নামে তিনখানা গাঁয়ে প্যালা তোলা।

ও বজরা। তুই ওরকম করে তাকাচ্ছিস কেন? আমি তো তোর চোখ দেখি না—

দেখাচ্ছি চোখ।

ও বজরা ?

বজরা কোন জবাব না দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। হৃদয়ের গলা তাকে একদম থামিয়ে দিল। নিজির মায়ের পেটের সহোদরকে ডরাতে হচ্ছে বলে হৃদয় নস্করের গলা বুজে এলো। সে লেংচে লেংচে অন্ধকার এবড়ো খেবড়ো মাঠে পিছিয়ে যেতে চাইলো। আর সঙ্গে সঙ্গে শেষ চেষ্টা দেখলো—কি ভাবে বজরাকে থামানো যায়। বলো। কি বলতি চাও ?

বজরা একদম থেমে গেল। এ গলা সে চেনে। বড় ভাইয়ের চাপদাড়ির চার আঙুল ওপরেই দুই ঝিনুক-কুচি আঁধার। ওখানেও তো চোখ থাকার কথা। বজরার হাত থেকে একটু আগে কুড়িয়ে তোলা বেঁটে মত কচার মরা ডালখানা ভোঁতা শব্দে পুকুর পাড়ে পড়ে গেল। যাও। ঘরে যাও—

হৃদয় কোন কথা বলতে পারলো না। বজরা তখন তাকে দু'হাতে তুলে ধরে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিল। এবড়ো খেবড়ো ধানকাটা মাঠে যে-কেউ যখন তখন পড়ে যায়। আর এই আঁধারে তার দশার লোক তো যখন তখন ঢলে পড়বেই।

ঘরে যাবার আগে দুই নস্কর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো। আওয়াজটা দু'জনেরই খুব চেনা। কয়লাখোর সেই বুড়ো ইঞ্জিনটা নিজির পেটের ভেতর আগুনে আর কয়লায় দলা পাকাতে পাকাতে ফাঁপা রেলপোলটা পার হচ্ছে। সারা দুনিয়া হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার ঠিক আগেকার শব্দ তুলে।

বজরার আর ঘরে ঢোকা হল না। মামলার তদ্বির করে ফেরার পথে ডাকঘরের পেছনে আলিপুরে সে আসামীভোগ মিল সারে। তারপর কিছু একটা কেনাকাটা তার অভ্যেস। এভাবেই এই রোয়া তোলা কম্বলখানা কিনেছিল বজরা। একবারও না কেচে তাই দিয়ে দু'টো শীত পার করে দিল। আর তো ক'টা দিন পরেই ফাগুন মাস।

একটু পরে টের পেল—এতো তাদের বাড়ির উঠোন নয়। পুকুর পাড়ও নয়। পায়ের নীচে মোটা মোটা চওড়া পাতি ঘাস। ঘচাং করে তার মাথার ভেতর গোগাড়ির চাকা গোল হয়ে ঘুরতে লাগলো। চোখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে মনে হোল একবার। আসলে ঠাণ্ডায় বজরার চোখের পাতি তখন হিম কঠিন। এরকম ঘাসে ঢাকা মাঠের ওপর দিয়ে চিনির বস্তা বোঝাই গোগাড়ি টেনে নিয়ে যায় মোষ। যার পাকাপোক্ত কোন ফয়সালা আজও করতে পারেনি বজরা। হোলসেল বলে ফুল পেমেণ্ট। এদিকে বিলে মিস্ত্রীর নেই কোন দেখা। সে'তো উড়ে উড়েই বেড়ায়। কতকাল যে কাঁচা পয়সার মিঠে আওয়াজ শোনে না বজরা।

মাঠে, বাঁশ বাগানে, দিগন্তে, রেলপোলে ভোর আসে সবার আগে। ধুলো বোঝাই কম্বলে পিঠ আর বুক ঢাকা বাঁধের উঁচমত

জায়গায় শোয়ার উদ্যোগ করতে না করতেই বুক খোলা বাতাবির রঙ মেখে ভোর আর আলো একসঙ্গে এসে হাজির। বজরা জানে, একটু বাদেই এ আলো আরেকটা লাফ দিয়ে একদম আলিপুর ডাকঘরের বারান্দায় গিয়ে পড়বে। শীতে খোঁচানো চোখ খুলতে কষ্ট হচ্ছিল বজরার। খানিক খুলেই তার মনে একটা কথা উড়ে এসে পড়লো। এই আলো যে কত জায়গায় বেড়াতে যায়। আলিপুর যায়। শেয়ালদা যায়। আবার তাদের মত চাষা ফেমিলির উঠোনে এসেও সারাবেলা তেরছা হয়ে পড়ে থাকে। কেন যে বড় ভাইরে ডরাতে গ্যালাম—কী দরকার ছেলো।

এবারে বজ্রেশ্বর নস্কর পুরোপুরি চোখ মেলে চাইলো। আলোতে একটুও রোদ্দুর নেই। তার বদলে হিম ছিটানো পাতলা বাতাস। সে বাতাসে বড় খুড়ো আর মেজো খুড়োর গা ফুড়ে ওঠা দীঘল ঘাসের ডগা মাথা দুলিয়ে জানান দিলো। ও বজরা—বজরারে—আমরা এখেনে—তোর কাছেই আছি আমরা।

বজরা এই দুলুনী দেখে ফিক করে হেসে ফেললো। দিনের বেলার রেলপোল। ক্ষ্যাপাচণ্ডীর শুখো বুক। মোটা দানার ছাই রং বালি। আর তার ওপারেই রেলপাটির বাঁক টপকে বাঁশড়ার বাঁশবন। গা গরম। ফোলা ফোলা চোখ। গায়ের কম্বলখানা ঝুলে পড়েছে। এত ঠাণ্ডা বলে রাখালরা এখনো গরু চড়াতে বেরিয়ে পড়তে পারেনি। গুটি গুটি পায়ে বজ্রেশ্বর গিয়ে বড় খুড়োর গায়ে বসলো। তারপর সেই বালকবয়সের ধারায় অনেক কাল পরে মাথাটা রাখলো মেজো খুড়োতে। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে ফেললো। একবার শুধু মনে পড়লো—এগারো বস্তা চিনি। তারপর সে চিনিও সে বোজা চোখে হারিয়ে বসলো।

খুড়োদের গায়ে কতকাল আগের নদীর ঘ্রাণ। সেই বাস যখন তাকে জাগিয়ে দিল—তখন বেলা বারোটা দশের লোকাল লেজ তুলে ভাটিতে ছুটছে। উজান গাড়ি যে তার জন্যে আগের স্টেশনে

বসে আছে। এটা গেলে যে সেটা ছাড়বে। আকাশে তাকিয়ে বজ্রেশ্বর দেখলো, মাথার ওপর ভগবানের দেশটা আজ আবার মেঘে ঘষটানো, সেই সঙ্গে বাতাসের ভেতর এতখানি বেলাতেও শীতের ছিটে। তার নিজের গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। শক্ত ব্যথায় পা দু' খানা মেলে দিল সেঝো খুড়োর গায়ে। চোখ আকাশে। বুকের কম্বল কোমরে। দীঘল ঘাসের ধারে হাত কেটে গেল। ব্যথার ভেতর কেটে গিয়েও আরাম। কিছু বোঝার আগেই আবার সে জ্ঞান হারালো।

দু'খানা মাঠ পেরিয়ে ভিনদেশী সেই কুকুরদের খোঁজে বেরিয়েছিল চুনী। সকাল থেকেও ঘুরে ঘুরে তাদের হদিশ পেল না। চুনী অবাক। অমন কালো কুচকুচে চেহারায় লাল চোখ। ভরাট ঘেউ ঘেউ। তারা সব উবে গেল কোথায়? এ কি ভোজবাজি? বসতি আছে। লোকজনও আছে। এমনকি পুকুরের জায়গায় পুকুর— গাছের জায়গায় সেই গাছ দাঁড়ানো। অথচ ওরা নেই।

ভাঙা মনে দুলকি চালে শর্টকাট করছিল চুনী। এমন শর্টকাটের সময় সে অনেক কিছু খুঁজে পায়। এক-কালের চেনা পথে একখানা পাথরের নিশানা—কিংবা একটা জিওলগাছের নিরিখ চিনতে পেরে এত ভাল লাগে তার। তখন তখনই সে-সময়কার সব মনে পড়ে যায় চুনীর। কত আলো—কত আঁধার—কত খাওয়াদাওয়ার কথা মনে পড়ে যায় তার। জীবনটা বুঝি এরকমই। রেলপোল। পাথরের চাঁই। বাঁশবন। প্ল্যাটফর্ম। জিলিপি পাড়া। লেড়ো বিস্কুট পাড়া। কত কি দিয়ে যে দুনিয়া সাজানো।

কম্বল ঢাকা বজরা তার চোখে পড়ে গেল। এ লোকটা কি এরকমই মাঠে ঘাটে পড়ে থাকে মাঝে মাঝে? একদম অন্যরকম লোক। অন্য সময় তাকে দেখলে লাথি ঝাড়ে। চুনী মনে মনে ক্ষমা করে দিয়ে পাথর বেয়ে উঠলো। শুঁকলো দু'বার। কম্বলটা দাঁতে টেনে ফেলে দিল।

সুবিধে হল না চুনীর। এ লোক ওঠার নয়। চুনী তার নিজের পথ ধরলো।

পড়তি বেলায় শীত এসে জমতে লাগলো বজরার বুকে। একটু পরে সেই ঠাণ্ডাই তাকে জাগিয়ে দিল। বজরা মাথা তুলে আবার মেজো খুড়োতে রাখলো। কি শীত। কি শীত। জগৎ সংসারের সব শীত এখেনে নাকি! সেই সঙ্গে বজরা শুখো নদীর বাস পেলো। মেজো খুড়োর গায়ে। ন'খুড়োর গায়ে। সেঝো খুড়োর গায়েও একই ঘ্রাণ। নদীর গন্ধ এমন হয়? আর সাজিয়ে সাজিয়ে ভাবতে পারছিল না বজ্রেশ্বর। দূরে দূরে গরু বাছুর চরে বেড়াচ্ছে। রাখালরা বুইচি ফল তুলছে। আমিও একসময় তুলিছি বড় খুড়ো। বিড় বিড় করে বকতে বকতে মাথাটা আবার খুড়ো মশায়ের গায়ে পেতে দিল। যেমন ভাবে দিতো বালক বয়সে। বড় খুড়োরে—। আমারে ডরায় বড়ভাই। আমার ভয়ে আঁধারে পড়ে যায় বড় ভাই। বলতে বলতে নিজের অজান্তেই কখন কেঁদে ফেলে বজ্রেশ্বর। পাথরে শীত। পাথরে শান্তি। মাথা পেতে দিলে মাথার ভার রাখে পাথর। পড়তি বেলায় মানুষের কচি গলা উঠে আসছিল খুড়োদের গা দিয়ে। মাথা রেখে চোখ চাইলো বজরা। সে এখন পাথরের চাঁই ফেলা উঁচু জায়গায় বসে।

নিচে নদীর শুকনো সোতা ধরে দশ রশির মত তাকিয়ে বজ্রেশ্বর দেখতে পেল—তার তিন ভাইপো—খন্তা হাতে। বড়টার কাঁধে শাবল। শীতে ভেজা ঘাসের চেনা জায়গা ধরে ওরা খুঁড়তে বসলো তিনজনে। একাজ বজরাও করেছে একসময়। বড় ভাই তাকে সঙ্গে নিয়ে এমনি শীতের ঘোলা দিনে কচ্ছপের বাসা খুঁজে ফিরতো শাবল হাতে—ডালা কাঁধে। সুদি কচ্ছপ—ছুর—কালি কাঠা—কত কি ধরে ফেলেছে দু'ভাই। উপরি পাওনা—কচ্ছপের ডিম।

বজরার শরীরটা এখন ব্যাথার দখলে। তবু জ্বর বোধ হয় পা দিয়ে নেমে গেল। বুঝলো—এই তিন কচির সঙ্গী এখন ওদের

উড়োনচণ্ডী খুড়ি। বিলে মিস্ত্রী যদি কিছু টাকাও দিতো—সবটা যদি গাপ করে বসে না থাকতো—তাহলি কি এভাবে মাঠে মাঠে রোজ দিনের খাবার খোঁজে কেউ? উঠতে গিয়ে দেখলো—ওঠা যাচ্ছে না। নিজের শরীরের ভেতর সে কোন বলভরসা পেল না। একবার ইচ্ছে হোল—উঠে গিয়ে তিন খোকার সঙ্গে বসে বসে শাবলে গর্ত খোঁড়ে। বড় কচ্ছপ থাকলে তো ওরা ধরতেই পারবে না। ওগুলো বড় ধড়িবাজ হয়। মাটি খোবলানোর শব্দে সিধে নিচে নেমে যাবে।

ওই তো সনেকা। ওরে তোর তো একবার ওদের পাশে গিয়ে বসা দরকার। এই—

গলায় কোন স্বরই ফুটলো না বজরার। মাঘের শীতে ভুঁইয়ে পড়ে থাকা! জ্বর দিয়ে তার দাম দিতি হবে না!

উঠে দাঁড়াতে না পেরে—চেঁচাতে না পেরে—নিরূপায় বজরা একটু নেমে মেজো খুড়োতে বসলো। ঠেসান দিল বড় খুড়োর গায়ে। জানলায় লোকের মুখ বসানো একখানা ট্রেন পাস করলো। ও সনেকা—

সনকা নস্কর তখন হলুদ রোদ্দুরে একা একা বুইচি খাচ্ছিল। বুইচি কোচড় বোঝাই। মাথাটা পাখির বাসা। এখান থেকেও বজরা সনকার খোলা পিঠের একফালি দেখতে পেয়ে নড়ে চড়ে বসতে গেল। পারলো না। এ কি জ্বররে বাবা! গায়ের জোর কোথায় গেল?

বজরার চোখ ছোট হয়ে এলো। তাকাতে বা দেখতে কোন বল লাগে না। পাকা বাঁশের ঝুলে পড়া ডগা টেনে ছেড়ে দিয়ে একটা লাফ দিলো সনকা। আর সেই সঙ্গে খলবলানো হাসি। ফাঁকা মাঠের ভেতর সেই বাঁশখানা সারাটা ঝাড় জুড়ে দুলতে লাগলো। পড়তি আলো ছিঁড়ে খুঁড়ে বাঁশের ডগাটা ওঠে নামে। আর সনকা হি হি হাসে।

এত হাসির কি পেলো। অনেকদিন পরে পাশ থেকে নিজের বউকে পরের বউ লাগছিল বজরার। তাকে বোধ হয় সনেকা এদিকে তাকালেও চিনতে পারবে না। খয়েরি রঙের কম্বলখানা বজরাকে এখন আরেকখানা পাথরের চেহারা দিয়ে বসে আছে। তবু খুব জোর দিয়ে ডাকলো। এই স—নে—কা—আ—

বসে যাওয়া গলার ভেতর দিয়ে শ্লেষ্মা জড়ানো কিছু আওয়াজ বেরোলো মাত্র। এত মজা কিসির? একথাটুকুও ভালো করে বেরোলো না গলা দিয়ে।

নাচুনে সনেকা এবার একটা নোনা গাছের ডাল ধরতে গেল লাফিয়ে। পারলো না। নিচেই একদম বর্ষাকালের আল। এখন একদম পাথুরে। শূন্য থেকে সেখানেই পড়লো—আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা গড়িয়ে গেল।

ইস। ব্যথাটা লাগলো যে—

আরও কি বলতো বজরা। বলা হোল না। বাঁশের ঝাড়ের ঠিক পাশে খানিক জায়গা জুড়ে পুরনো এক পাঁজা। কবে কারা ইঁট পোড়ায়। কিন্তু পাঁজা খোলা হয়নি। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বিলে মিস্ত্রী সনেকাকে পাঁজা কোলে তুলে নিল।

চিড়বিড় করে উঠে দাঁড়াতে গেল বজরা। এবারো পারল না। লাভের ভেতর পা হড়কে তার শরীরটা ন'খুড়োতে গিয়ে কোনরকমে লটকে গেল। নাহলে আরও কয়েক হাত পিছলে নামতে নামতে তার মাথাটা আরো কয়েকবার পাথরের চাইয়ে ঠুকে ঠুকে নামতো। সারা চোখে অন্ধকার নেমে এলো। নাকের ডগাটাই এখন যেন তেকোনা আরেকখানা পাথর। ছোট পাথর। চোখ মেলতে দেখলো, বিলে সনেকাকে এক দলা যমজ ঝামায় বসিয়ে ভালো করে মসটে মসটে হাঁটু ডলে দিচ্ছে। আর সনেকা—

এখান থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় না। হাসছে? না, কাঁদছে? উঁহু। হাসছে? হবেও বা। বোঝাও যায় না ঠিক। কিন্তু বিলেটা

আসে কি করে? কি করে আসে? আর তাকাতে পারছিল না বজরা। সনেকা নস্কর উঠে দাঁড়ালো। বিলের গায়ে চেক শার্ট। শার্টে ঢাকা কাঁধে ভর দিয়ে।

এরই ভেতর তিন খোকা খোন্তা হাতে খুঁড়তে খুঁড়তে নদীর শুখো সোতায় নেমে পড়ছে—তাও দেখতে পেল বজরা। তার চোখে কেউ এখন লোহার শিক গুঁজে দিলে দিনমানে দুই আধুলি আঁধার সে-জায়গার দখল নিত।

বিলের শার্ট—সনেকার আধখোলা পিঠ—বজরার চোখের ওপর পেছন ফিরে দিব্যি আখোলা পাঁজার আড়ালে চলে যাচ্ছে। সনেকার মাথার পেছনটা দেখতে দেখতেও বজরা বুঝলো—মাথার ওপিঠে সনেকার মুখে এখন হাসি। হেসে হেসে খুলে যা মাগী। পাঁজার নিচির বাস্তুসাপ কাটুক তোদের। শেষমেষ সেই বিলে মিস্ত্রীর সঙ্গে? আমার চোখে সব ধরা পড়ে। আর আমি টেরও পাইনি! শেষে বাঘের বাসায়—

এইবার বজ্রেশ্বর টের পেল—শীতেরও একটা ওজন আছে। তার ভার কষ্টের ওজনের চেয়ে কিছু কম নয়। তার পিঠের নিচে খুড়ো মশায়রা। বুকের ওপর শীত। কষ্ট। এর ভেতর শুধু জ্বরটাই যেন কোন হাল্কা জিনিস। বজরা খুব অবাক হল। সে কোনদিন ভাবেওনি—সনেকার জন্যে তার বুকের কপাটে একখানা ছুঁচলো পাথর বিঁধে যাবে।

বজ্রেশ্বর নস্কর পরিষ্কার দেখলো, তার এ-দশায় ক্ষ্যাপাচণ্ডীর শুখো সোতার কোন আতান্তর নেই। শুধু শাদাটে সোতার ওপর তিন খোকার কচি মাথাগুলো বেরিয়ে আছে। ওরা আরেকটু নামলে উঁচু পাড়ের ঘাসবনে সেসব মাথা আর দেখা যাবে না।

বজ্রেশ্বর মাঘের বিকেলের হলুদ রোদ্দুরের লাইনগুলো ধরে ধরে আকাশে তাকালো। সেখানে কোন গাছ নেই। রেল নেই। নদী নেই। নদীর শুখো বুক নেই। তার বদলে সন্ধ্যের জন্যে

কিছু শীত আর অন্ধকার তৈরি হয়ে দাঁড়ানো। বজরা বুঝলো, রোদ্দুর মুছে যেতেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এখান থেকে তার এখন ওঠা দরকার। রেলবাজারের মাছি ভন ভন আওয়াজ যে কত মিঠে—ঠিক এখনই তা বুঝলো বজরা। ভাইপোদের নাম ধরে ডাকলো। গলায় শুধু কয়েকটা ভাঙা কথা ফুটে উঠে ঠোঁটের কষে গড়িয়ে পড়লো। তখন তার পিঠের নিচে খুড়ো মশায়রা একসঙ্গে জানতে চাইলো। বলো? কি বলতি চাও? বলো?

বজ্রেশ্বর নস্করের দু'চোখের কোণে এইসময় কিছু জল এসে দাঁড়ালো।

খানিকবাদে অন্ধকার আর শীত হুড়মুড় করে নেমে পড়লো। তারা উঁচু নিচু সব সমানে ভরাট করে ফেললো। সেই সঙ্গে তারা বজ্রেশ্বর নস্করের খোলা চোখ পেয়ে তাতে ঢুকে পড়লো—আর যতটা পারে চোখের ভাসা ভাসা দুই ঢেলা চেখে দেখতে লাগলো। এর আগে বোধহয় শীত কখনো চোখ খেয়ে দেখেনি। অন্ধকারও না।

এতসব ঘটে যাওয়ার আগেই তিন খোকা খন্তার ডগায় একটা সুদি কচ্ছপ ঝুলিয়ে থলবল করতে করতে মাঠ পেরিয়ে গেল। আসলে অন্ধকারই পায়ে পায়ে খোকাদের এ তল্লাট পার করে দিয়ে এলো। বজরার কিন্তু এত কিছু দেখাই হল না।

একদিন সকালে একটা খবর পেয়ে অনন্ত বাঁড়ুজ্যে লাফাচ্ছিল। রেলপোলের সেই শুকনো ক্ষ্যাপাচণ্ডী এখনো খেয়াদার কাছাকাছি খনিক জায়গায় জল ধরে রাখে। জায়গাটা বাওড়ের চেহারা পেয়েছে। সেখানটায় এখন অপরিযাপ্ত মাছের চাষ। খুব মাছ বাড়ে বলে—লোকে বলে—অন্যায় মাছের চাষ। পয়লাবার শুনে অনন্তও ঘাবড়ে গিয়েছিল। কথা বলে বুঝলো—অন্যায় মানে অনেক। ওখানে মাছের ব্যাপারী সুশীল বাগ অন্যায় পয়সাওয়ালা লোক।

তার একমাত্র ছেলে। খুব ভাগ্যবান। সম্প্রতি বউটি গত হয়েছে। কোন কাচ্চাবাচ্চা নেই। বয়সও বেশী নয়। সুশীল বাগের সামনে বুঝিয়ে কথাটা পাড়তে হবে। পাত্রী তো বেধবা।

সেই কথাটি পেড়ে জুতো পেটা হওয়ার পর অনন্ত বাঁড়ুজ্যে ভাঙা মনে বাড়ী ফিরছিল। পাত্রী বিধবা শুনে সুশীল বাগ খুব চটে যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণকে জুতোপেটা করায় তার বিবেক বলে—দশটি ট্যাকা দাও বুড়োরে। তাই দেয় সুশীল বাগ। সঙ্গে প্রমাণ মাপের সিধে। গামছায় বাঁধা। আর একটি হ্যারিকেন। কেননা অনন্তর রওনা হতে হতে বিকেল পড়ে যায়। মাঠ ভেঙে অনেকটা গিয়ে তবে চন্দনেশ্বর জংশনের রেলপোল পড়বে।

দিন ফুরোবার আগেই হ্যারিকেন হাতে অনন্ত বাঁড়ুজ্যে মাঠে নেমে পড়ে। দুপুরে অন্যায় খাটতেছে সুশীল বাগ। রওনা হওয়ার সময় বাগ মশায়ের লোক হ্যারিকেন ধরিয়ে দিল।

এই দিনি দিনি আলো জ্বেলে যাবো ?

মাঠের মধ্যি ধরাতি বেগ পাবেন বাঁড়ুজ্যে মশাই। বড় আঁধার।

কথাটা সত্যি। কোমরে দশ টাকার নোটখানা গজ গজ করছে। কাঁধের গামছায় অন্তত তাদের তিনদিনের চাল। সরোজ খুশীই হবে।

ভাগ্যিস হ্যারিকেনটা দিল। নয়তো দিনের বেলার সিধে রাস্তা রাতে রাতে ঘোরালো হয়ে যায়। তারপর আবার এবড়ো খেবড়ো। ক'বার হোঁচট খেতে খেতে হ্যারিকেনটা অনন্ত ভেঙে ফেলছিল প্রায়। হ্যারিকেনই তাকে বলে দিল—বাঁড়ুজ্যেমশাই। ক্ষ্যাপাচণ্ডীর গা ধরে চলো। জল তো নেই। রেলপোল পড়লি রেলবাজারের আওয়াজ কানে আসবেনে—

কিন্তু সেই রেলপোলের কাছে এসেই পথ গুলিয়ে গেল অনন্তর। শাদা বালিতে হ্যারিকেনের আলো পড়ে নদীর বুকেই অনন্ত ধাঁধায়

পড়ে গেল। তার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়ে সরল রাস্তা ঘোরাল পাক নিল। অনন্ত শুকনো নদীর বুক ছেড়ে পাড়ে উঠলো। আকাশে রেল বাজারের আলোর আভা। কিন্তু এখান থেকে চেঁচালেও কেউ সাড়া দেবে না। মহা গেরো!

এই কথাটি বলে নিজে নিজেই অনন্ত রেলপোলের কানাতে বড় বড় সেই পাথরের চাঁইয়ে গিয়ে হাজির হোল। সেখানে তখন অন্যায় অন্ধকার। তাতে হ্যারিকেনটা কোন কূল পাচ্ছিল না। কোনদিকে যাবে বুঝে উঠতে পারলো না অনন্ত।

তখনই তার পায়ের সামনের পাথরখানা নড়ে উঠলো আর অমনি হাতের হ্যারিকেনটা খসে পড়ে চুরমার।

বজরা কোনরকমে বললো, ভয় পাবেন না। আমি—

খানিকক্ষণ চুপচাপ। অনন্ত অনেক কষ্টে কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, আমি আবার কে?

আমি বজরা—

ওঃ! তুমি। বাঁচালে।

মরে যাচ্ছি বাঁড়ুজ্যে মশাই।

অনন্তর তখনো বুকের কাঁপুনি থামেনি। একটু বসি তো আগে। কতটা পথ—। তা এখানে বজরা? কোন কাজকম্ম আছে বুঝি!

আমি মরে যাচ্ছি।

কোথায় তুমি? বলে অনন্ত আন্দাজে হাত বাড়াতেই বজ্রেশ্বরের পেটে গিয়ে ঠেকে গেল। উঃ! এ তো অন্যায় জ্বর। এখানে শুয়ে আছো? সান্নিপাতিকে গিয়ে দাঁড়াবে শেষে। অন্যায় ঠাণ্ডা চারদিকি।

বজরার কোন কথাই ফুটলো না মুখে।

আট

আজ সারাটা দিন নাড়ু শী যাকেই পেয়েছে—তাকে ধরে বলেছে, আমাদের শশীকে দেখলে ?

কেন ? কোথায় গেছে ?

নাঃ। কিছু না। এমনি।

আবার কেউ বলেছে. সে তো আপনার ছেলের বাসে করে বেড়াতে গেল। বলে যায়নি ?

নাঃ! বলেই নাড়ু কথা ঘুরিয়ে নিয়েছে। মানে হ্যাঁ। ফিরে আসার কথা আগে আগে। সন্ধ্যে সন্ধ্যে ফাঁকা গদিতে বসে নাড়ু নিজেকেই বললো, আমি পরিষ্কার দেখলাম। সজনেতলা দিয়ে হেঁটে এলো। বেড়াতে যাবার জন্যে বানানো পাঞ্জাবী গায়ে। কোথায় গেল ? কোথায় যেতে পারে ? শশীর ব্যাভার.তো কোনদিন এ প্রকারের নয়। তবে ?

সারাদিন ধরে ভেবেও কোন কুলকিনারা করতে পারলো না নাড়ু। এই দেখলাম। এই নেই। উবে গেল নাকি।

ঝাঁপ বন্ধ করবে করবে নাড়ু। এমন সময় ন'টা চল্লিশের ট্রেন থেকে নেমে স্নেহময় চেকার সিধে এদিকেই এগিয়ে এলো। তাকে দেখে নাড়ু অবাক। এখন তো ফেরার কথা নয়। কি ব্যাপার ?

সব্বোনাশ হয়ে গেছে শী মশাই।

স্নেহর পেছন পেছন তার বউ। কথার মাঝে তাকে দেখতে পেয়ে পটাং করে বলে দিল, রিক্সো নিয়ে বাড়ি চলে যাওনা তুমি। আমি যাচ্ছি।

বউ গেল না। বললে, বাক্সোটা ?

আঃ। বলে চটে উঠলো স্নেহময়। বললাম তো থানায়

রেখে দিল। এখন রিক্সো নিয়ে তুমি বাড়ি যাও তো। এধারে ফিরে আবার একই কথা বললো স্নেহময়। সব্বোনাশ হয়ে গেছে।

থানা শুনেই নাড়ু স্থির। আঃ! এক কথা বার বার।

জগন্নাথ অ্যারেস্ট হয়ে গেল।

কি?

হ্যাঁ শী মশাই। সে নাকি খুনী।

কে? জগা? কাকে?

শশীকে নাকি খুন করেছে জগা—

আমাদের জগা? কখনো না। শশী তো ফিরে এলো।

না শী মশাই। শশী খুন হয়েছে। জগার হাতে। জগা নিজেই কবুল করলো। আমার সামনে। বোলপুর থানায়—।

ততক্ষণে দু'জনকে ঘিরে বাজারের লোক। খোলা গদিতে নাড়ু বসে পড়লো। তার সবই গুলিয়ে গেল। চন্দনেশ্বর থেকে বোলপুর অনেক দূরে। এখান থেকে এখন ওখানে যাওয়ার কোন উপায় নেই। অথচ না গিয়ে তো কিছু বোঝাও যাবে না। নাড়ু অনেক ভেবে জানতে চাইলো, বাস কোথায়?

বোলপুর থানায়। জগন্নাথ নিজেই তো ড্রাইভারকে বাস থানায় নিয়ে যেতে বললো। তখনো আমরা কিছু বুঝে উঠতে পারিনি। ভাবছি—এই বুঝি ট্যুরিস্ট বাসের নিয়ম। নয়ত থানায় কেন?

কি বাজে বকছো। গুছিয়ে বল চেকারবাবু।

অন্য সময়ে নাড়ু শী তাকে আপনি বলে। তুমি বলায় স্নেহময় কিছু বললো না। বরং পুরো ব্যাপারটা আরও খুলে বলতে লাগলো। জগার মুখ দেখে কিছু বোঝা যায়নি আগে। তখনো জানি না—জগন্নাথ পাগল হয়ে গেছে—

কে?

হ্যাঁ। জগন্নাথ। আপনার ছেলে। এখন সে বদ্ধ পাগল।

ভারি হাতে নাড়ু স্নেহময়ের গালে আচমকাই ঠাস করে একখানা

চড় কষালো। সে চড়ের ওজনে স্নেহময় টাল রাখতে না পেরে সটান মেঝেতে। গালে হাত দিয়ে উঠে বসলো।

নাদু শী গজরাচ্ছিল। যত্ত সব গাঁজাখুরি কাণ্ড! এইতো কাল আমি শশীকে দেখতে পেলাম। সে ব্যাটা লুকোলো কোথায়? পাগল হয়ে থাকলে তুমি হয়েছো চেকারবাবু।

না। বলে চেঁচিয়ে উঠে দাঁড়ালো স্নেহময়। আমার বয়েই গেছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চড় খেতে। আমি যাচ্ছি। সারাদিন ট্রেনে কাটলো। খবর দেওয়ার ছিল—দিলাম। বিশ্বাস না হয় দেখে আসুন। আপনার গুণধর এখন বোলপুর হাজতে। দড়ি বেঁধে রেখে দিয়েছে তাকে। মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছে। শশীর লাশ আমি নিজে থানার বারান্দায় কাপড় ঢাকা অবস্থায় দেখে এলাম।

কাপড় তুলে দেখেছ? সে শশী?

মিথ্যে বলে পুলিশের লাভ! জগন্নাথের কথা মত পুলিশের গাড়ি গিয়ে ডেডবডি নিয়ে ফিরে এলো। আমরা প্যাসেঞ্জাররা তো তখন সবাই থানার বারান্দায়। এ তো কাল সন্ধ্যের কথা। বিশ্বাস অবিশ্বাস—আপনার ইচ্ছে শী মশাই। আমি চললাম।

এ কথায় চার দিকের ভিড়ের ভনভনানি একদম থেমে গেল। তখনই শেয়ালদার শেষ গাড়ি এসে দাঁড়ালো। প্যাসেঞ্জারদের সবারই কান মাথা কম্ফোর্টারে ঢাকা। শীত যাবে বলে শেষ কামড় কামড়াচ্ছে। একদম হাড়ে গিয়ে লাগে। দেওয়ানের হাফপ্যান্টে আধখানার কোট গায়েও চুনীর শীত মানায়নি। সে এসে ঘুর ঘুর করছিল। নাদুর কী হোল। ক্যাঁক করে এক লাথি কষালো চুনীর পেটে। এ রকম ব্যাভার চুনী ভাবতেই পারেনি। দূরে গিয়ে শী মশায়ের মুখে চোখ রেখে বসে থাকলো।

ফাঁকা গদি। লোকজন সবাই চলে গেছে। পাশের মিষ্টির দোকানে থাক থাক সাজানো গুড়ের নাগরি থেকে গন্ধ ভেসে

আসছিল। সেদিকে মুখ ঘোরাতেই নাড়ু দেখলো—সে এখন কোণে বসে থাকা চুনীর নজরবন্দী হয়ে আছে। খুব ভাল লাগল না ব্যাপারটা। ঠিক এই দশায়। চেকার স্নেহময় যা বলে গেল—তা যদি সত্যি হয়ে থাকে তো মহা ভজকট। আমি তাহলে সজনে-তলায় কাকে দেখলাম? জগাই বা কেন শশীকে খুন করবে? কিসব অদ্ভুত কাণ্ড। এখন যদি একটা ঘোড়া তার গদিতে এসে ঢুকে পড়ে মুখ বাড়ায়—ঠিক তেমনই অদ্ভুত ব্যাপার।

উঠে গদি বন্ধ করলো নাড়ু। তার তে-চাকার পেছন পেছন গিয়ে নাড়ুকে চুনী বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এলো। বাড়ি ঢুকে নাড়ুর আর দোতলায় যাবার ইচ্ছে হোল না কোন। এটা এক সময় ছিল আনন্দের বাড়ি। এখন এখানে রাধিকে এসে ইস্তক সব সময় শোক ঝুলে থাকে দোতলায়—একতলায়। পায়ের পাম্পসু খুলে নাড়ু নিজের বাসার খাটে শুয়ে পড়লো। কি অদ্ভুত! যাকে এখানে দেখি-- সে খুন হয় বোলপুরে? তবে কি? তবে কি শশী মরে গিয়ে দেখা দিতে ঘুরে গেল? যেমন নাকি রঘু এসে থাকে। রাধিকে দেখতে পায়। আসার পথ চেয়ে সাজগোজ করে বসে থাকে সন্ধ্যে সন্ধ্যে।

অন্ধকার ঘরে একবার একা খাটে নাড়ু কেঁপে উঠলো। রাস্তার লোকজন যে দু'চারজন শেয়ালদায় বাঁধাকপি কিনে লাস্ট ট্রেনে ফিরেছে—তারা স্টেশনে নেমেই খবরটা শুনেছে। রেলের চায়ের দোকানে। তারাই রাস্তায় বলাবলি করতে করতে বাড়ি ফিরছিল। তাদের একটা দুটো কথা কানে আসতেই ভাল লাগলো নাড়ুর। দরজায় খট্ খট্ শুনে নাড়ুর যখন ঘুম ভাঙলো—তখন রাত সাড়ে তিনটে। বিছানা থেকে টর্চ মেরে দেওয়াল ঘড়িটা দেখলো। এখন আবার কে?

সাবধানে জানলা ফাঁক করে নাড়ু জানতে চাইলো। কে?

দরজা খুলুন। আমরা সদর থানা থেকে আসছি।

ঘুমিয়ে সব ভুলে গিয়েছিল নাহু। বাইরের আলোটা সুইচ টিপে জ্বালালো। গাছপালারাও এখন ঘুমে। জগা তাহলে শশীকে খুন করেছে। কিন্তু কেন? কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না নাহু।

দরজা খুলুন।

খুলছি। খুলছি। এই জুতোটা খুঁজে পাচ্ছিনে। পায়ে পাম্পসু গলাতে গলাতে পয়লা কথাই মনে পড়লো নাহুর—কোন ফৌজদারি উকিল দেবে। ভবানীপুরের সুরেনবাবু? না মানিকতলার নটবর পালিত। পাগল হয়ে গিয়ে জগাটা বেঁচে গেল। নয়তো ফাঁসির দড়ি নির্ঘাৎ। পাগল প্রমাণ করতে পারলে সে সুরেনবাবুকে আলাদা একটা থোক টাকা দেওয়ার কড়ার করে নেবে। পাগলের তো ফাঁসি হয় না! কিন্তু শশীকে কেন খামোকা খুন করতে গেল। এই খুলি—বলে দরজার ছিটকিনি নামালো নাহু। ছুটে গিয়ে।

জ্বর সেই সান্নিপাতিকেই দাঁড়ালো। একুশদিনের দিন দুপুরবেলা অন্ন পথ্য করে উঠে বসলো বজ্রেশ্বর। খোড়ো ঘরের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে, দখিনা বাতাসের তোড়ে খিরিশ গাছটা ডালপালাসুদ্ধ লুটোপুটি খাচ্ছে। সনেকা ঘরের বাইরের বারান্দায় শামুকের খোল ভাঙছিল। বজরার মুখের স্বাদ ফিরিয়ে আনতে বাটিচচ্চড়ি রাঁধবে। সেই কাজের ফাঁকে উঠে এসে সনকা লোহা দাগ করে শিউলি রস খাওয়ালো বজরাকে। খাইয়ে চলে যাচ্ছিল। বজরা ডাকলো।

কি?

তোমার এ জায়গা ভালো লাগে সনেকা?

এখন শোনার সময় নেই। কত কাজ বলতো।

বজরা মনে মনে বললো, তুমি বিলেরে কতদিন চেনো? মুখে বললো, এট্টু কাছে বসো না।

এই সময় বড় ভাই এসে পড়ায় কথা থামাতে হোল বজরার। হৃদয় নস্কর প্রায় ন্যাংটো। সর্বাঙ্গে পাঁক মাখানো। জাওলা পেতেছে খালে। একটা বড় গজাল ধরা পড়লো।

বেচে দে আসো বাজারে।

পাঁক মাখানো শরীরে চোখ জোড়া হেসে উঠলো হৃদয় নস্করের। তুই যেদিন সৎ হবি—সেদিন ভগবানদারে ডেকে ভোজ লাগাবো। মাছটা এ ক'টা দিন নাকালে চুবায়ে রাখবো।

পাগলামো না করে মাছটা বাজারে দে আসো। আসুখির খরচা আমি জানিনে। দুগ্‌গা ফার্মেসীর ধার কত?

সে তোর ভাবতি হবে না—বলেই আবার হৃদয় খালে ফিরে গেল। জলে তার ঝপাং লাফ বিছানায় বসে শোনা গেল।

বাটি-চচ্চড়ি চাপিয়ে দিয়ে সনকা হাসি হাসি মুখে বললে, তোমার স্যাঙাৎ বিলেদা, সেই বিলেদা এসে নগদ পঞ্চাশটা ট্যাকা দে গেল। তুমি তখন জ্বরে বেহোস—

বিলে এসেছিল? ট্যাকা দে গেল! বাঃ! সবাই ভাল হয়ে গেল সনেকা—

সনকা তার স্বামীর মুখে বড় বড় চোখে তাকালো। খুব আস্তে বললো, নিজির থেকেই এলো।

তবে তো আরো ভালো। কেউ আর খারাপ নেই।

সনকা কি একটা অজানা অস্বস্তিতে ভুগতে ভুগতে চন্দনেশ্বর জংশনের সবচেয়ে বড় খবরটা ভাঙলো। সব বলে শেষে বললো, জগা তো এখন বদ্দ পাগল। পাঁচ মাইল দূরির থানায় আছে নাকি এখন। জগাবাবুর মা রোজ বিকেলে বাসে করে দেখতি যান। কাউকে চিনতি পারে না নাকি।

বজরা গুম হয়ে শুনলো। শেষে বললো, একটা খুন করেই পাগল? বলিহারি! এমন মন নিয়ে খুন করা কেন বাপু। এট্টু শক্ত হও। তারপর খুন খারাপিতে নামো।

শশী পাকড়াশির লাশ দেয় নি পুলিশ। ওরাই ঘাটের কাজ শেষ করেছে খপর দেছে—

বজরা আর কোন রা কাড়লো না। শশী যে কেন খুন হোল তা বুঝে উঠতে পারছিল না বজরা। তার মাথাটা ঘুরে উঠতে তিন চার ঘণ্টার জন্যে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমের শেষ দিকটায় একটা স্বপ্নের পরত ছিঁড়ে যেতেই বজরা আ আ বলে চেঁচিয়ে উঠে বসলো।

সনেকা গোহাল কাড়াচ্ছিল। সকালে করা হয়নি। এবার গরু নিয়ে ভাসুরপোরা ফিরবে। গোহাল থেকেই ছুটে চলে এলো সনকা। কি হলো?

বজরা বললো, কিছু না। আসলে সে একটু আগে নিজেকে দেখতে পেয়েছে ফাঁপা রেলপোলে স্লিপার ধরে সে ঝুলছে। হাত ছু'খানা পাথর। জলন্ত কয়লা ফেলতে ফেলতে মালগাড়ির ইঞ্জিনটা এগোচ্ছে—পিছোচ্ছে। নিচে আর পি এফ-এর মুখে সিগারেটের আগুন। বন্দুকের গুলি গিয়ে রেলপাটিতে লাগল। খটাং।

অমন চেঁচালে কেন? কি দেখেছো? বলো আমারে—

ফাগুন মাসের বিকেল। হাওয়া আসছিল ফুরফুরে। তার ভেতরেও বজরা ঘেমে একাকার। হাসতে চেষ্টা করে বললো, আমি যেন মাঠে শুয়ে আছি সনেকা। আর তুমি—বজরা এখানে থেমে থাকলো।

আর আমি?

বলতি লজ্জা লাগে।

বলো না।

তুমি চেক শার্ট গায়ে একটা লোকের কাঁধে ভর দিয়ে একখানা ইঁটের পাঁজার পিছনে চলে যাচ্ছো সনকা—

ধ্যাৎ। সত্যি?

হ্যাঁ। তাই তো দ্যাখলাম ঘুমের ভেতর। ভয় ধরে গেল। তুমি চলে যাচ্ছো।

বজরাকে কোন দিন এত নরম 'করে কথা বলতে দ্যাখেনি সনকা। সে এগিয়ে গিয়ে বজরার পাশে বসলো। বসেও স্থির থাকতে পারলো না। থর থর করে কথা বলতে লাগলো। ও সব স্বপ্নের কথা কখনো সত্যি হয় না। তাই না?

বজ্রেশ্বর মনে মনে একা একা বলে যাচ্ছিল, হয়। হয়। হয়। বলেও অনেকাদন পরে সনেকার গায়ের বাগানঘেরা গন্ধটা তার নাকে একরকমের সুবাস লাগলো। তবে একটু টক টক। নোনাগাছের ছালে—বাঁশের কষে যেমন আর কি।

সন্ধ্যে সন্ধ্যে ভগবান মোড়ল এসে বললো, টাকাটা আমরা দেওয়ান মাংসওয়ালার হাতে গাচ্ছিত রাখলাম। দিন স্থির করি। তুই রাজি হয়ে যা।

বজরা বাঁশের মাচায় বসেছিল। নেমে এসে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললো, নিজি সৎ হওগে আগে। আমারে সবাই ডরায়। আমি তোমাদের প্যালা তোলা ট্যাকায় মাথা মুড়োবো।

অত রাগিস কেন বজরা? সুখির সংসার তোর ভাল লাগে না?

সোমসারে সুখটা দ্যাখলে কোথায়?

ভগবান মোড়ল আর কথা বাড়ালো না।

ফাগুন মাসও যায় যায়। নিমফল গাছতলায় পড়ে পড়ে শুকোয়। দূরের বাতাসে ঢাকের কাঠির তড়াকং তড়াকং। মাঝখানে দোল। তার পরেই গাজন। এবার সন্ন্যেসি বেরোবে আলপথে। যাবে গাঁয়ে গাঁয়ে।

অনেকদিন পরে বজরা গিয়ে রেলবাজারে হাজির। শী মশায়ের ঝাঁপ নাকি আর খোলা হয় না। রাখাল গাজির মুদিখানার বাইরে পাতা বেঞ্চে বসে অনেক কথাই শুনলো। বিকেলের ভেতর দিয়ে

বাস এসে থামতেই একজন ছুটে এসে চেঁচিয়ে পড়লো। কুশবেড়েতে ডাকাতি হচ্ছে। বাসের জানলা থে দ্যাখলাম।

বাস থামলো ?

পাগল! আর থামে সেখানে! দিনির বেলা ডাকাতি দেখিনি কখনো।

বজরা সব চুপচাপ শুনতে লাগলো। আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝলো, এ কাজ পালানের। কাঁহাতক রাজসাক্ষী হয়ে আলিপুরি পড়ে থাকা যায়। দলে থাকতি পালানরে বাগে রাখতি কী বেগই না পোয়াত বজরা। যেমন সাহস। তেমনি অবাধ্য। ঘা কতক দিলি তবে সিধি থাকতো। এখন আর কে দেবে সে ঘা।

ডাকাতির কথা। শশীর খুনের কথা। পুলিশ হাজতে বদ্ধপাগল জগার কথা। সব শুনতে শুনতে সন্ধ্যে হয়। আকাশে তারা ফোটার আগেই ঘরে ফিরবে বলে বজরা উঠছিল। আজকাল সন্ধ্যের দিকে তার দুর্বল লাগে।

ফেরা হোল না তার।

উল্টো দিকের বাস থেকে দু'জন কনস্টেবল আর মহকুমা থানার সাইঝে বাবু নামলেন। নেমে সোজা বজরার কাছে। কোথায় চললি বজরা ?

কেন ? ঘর যাবো।

সেঝোবাবু এগিয়ে বজরার হাতটা ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ দু'জন তার কোমর দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললো।

আমারে কেন ?

থানায় চল। সব বলবো।

ভিড় হয়ে যেতে পারে বলে মহকুমার বড়থানার সাইঝে বাবু বাসে উঠে পড়লো। ফাগুন ফুরোনো ফুরফুরে বাতাসে বাস এসে থামলো থানার সামনে। থানায় তখন লোডশেডিং। বড়বাবু— মেজোবাবুরাও বারান্দার বেঞ্চে বসে। বজরা বসলো মেঝেতে।

কোমরে দড়ি। সামনের রাস্তায় সাইকেল রিক্সোর জট। আর ক'দিন পরেই দোল। সংসারে না জানি কত সুখ। আকাশের নিচি এ তল্লাটে এখন যেখানে যত ডোবা পুকুর আছে সব জায়গায় ছেঁচা চলছে। জাওলা মাছগুলো ধরে নিয়ে পাঁক তুলে ফেলা হবে। তারপর সে গর্ত বর্ষা অব্দি রোদ্দুরে শুকোবে। বজরা তার শরীরের ভেতরটা—মাথার ভেতরটা একবার ভালো করে ছেঁচতে চায়। সেখানে ভালো করে অন্ধকার ঘন হয়ে আছে। বড় ভাইয়ের ধরা গজালটা এখন নাকালে লটকানো। ছেঁচার জন্যে খাল বাঁধের ওপারে টইটুম্বুর জলে সে ব্যাটা এখন দাপায় নিশ্চয়। ভীষণ দাপায়। অসুখ থে উঠে বজরার এদানী বড় খাই খাই। চ্যাং মাছের ল্যাজা ভাজা কিংবা গোলমরিচ দিয়ে ঝোল। সেই সঙ্গে গন্ধ লেবু।

এ থানার বারান্দা-পাইখানা বজরার সব জানা। ক'বার সন্দেহে সন্দেহে তাকে এখানে এনে ভরে রাখা হয়। ছাড়াও পেয়ে যায় ক'বারই। তার ভেতর একবার মেথর ধর্মঘটে বজরা অন্যদের সঙ্গে পাইখানা সাফ করেছিল। বড়বাবুর আদেশে। এ হোল'গে আর এক বড়বাবু।

লম্বা সময় নিয়ে আঁধার যাচ্ছে বলে সাইঝেবাবুর অর্ডারে বজ্রেশ্বরকে হাজত ঘরে নিয়ে যাবার হুকুম হল। লোহার মোটা শিকের ওপারেই আরেক দুনিয়া। এপারে আজ্ঞে, আপনি। চা খায় লোকে। কথা বলে। হাসে। চাপড় দিয়ে মশা মারে। ওপারেই অন্য রকম। ইলেকট্রিক ফিরে আসতেই একটা আলো জ্বললো বটে। হাজতের লম্বা ঘরের সব জায়গায় কিন্তু সে আলো পৌঁছালো না।

বজরা খানিক মেঝেতে শুয়ে থেকে দেখলো—হাজত ঘর তো ফাঁকাই। শুধু কোণের দিকে গোঁফদাড়ি ঢাকা একখানা মুখ নিয়ে অফিসঘরের দিকে পা মেলে একটা লোক শুয়ে। আর ফাগুনের

ফুরফুরে বাতাস এ ঘরে ঢুকে পেচ্ছাপের গন্ধটা চারিয়ে দিচ্ছে। উঠে বসে সে হাজতের মোটা শিকে দাঁড়ালো। বড়বাবুর ঘর আলাদা। বাকি বাবুরা পর পর টেবিলে বসে। ও সাইঝেবাবু। আমারে ধরলেন কিসে? আমি তো কিছু করিনি।

সাইঝেবাবু কোন জবাব দিলো না। দিলো একজন দিশী পুলিশ। কুশবেড়েয় ঝুমুর নাচ কে নাচলো!

কুশবেড়ের ডাকাইতি? তখন তো আমি রাখাল গাজির দোকানে বসে—

সাইঝেবাবু কি লিখতে লিখতে মাথা তুললো এবারে। ছাখ্ বজরা। তুই আমাদের পুরনো পাখি। বড্ড রসিক মানুষ তুই।

ছ'মাসের ভিতর সাইঝেবাবু আমি কুশবেড়ে যাইনি।

সে-কথা মানি কি করে বল! সেখানে তো তোরই হাতের কাজ সব। আগুন লাগানো। বাঁশের মই ব্যাভার। শেষে পাইপ-গান। তাও দিনেমানে। অ্যাতখানি সাহস তোর ছাড়া কার হবে বজরা?

আপনি সাইঝেবাবু রেলবাজারে সাক্ষী তো নেবেন।

আলিপুরি মামলা উঠলি সাক্ষী তো তোর লাগবেই।

তাহলি এখন আমারে হাজতে পোরলেন কেন? জামিনে ছাড়েন।

জামিন হবেনে তোর কালি শিকদারের হাতে।

বজরা কেঁপে উঠলো। শিকদারদা থানার পুরনো হাবিলদার। হাতের পাঞ্জা ছোট একটা কুমড়ো সাইজের। মিহি ধুতি পরে। সেবারে বেদম পিটিয়েছিল বজরাকে। শেষে নাকের রক্ত দেখে বজরাকে ছেড়ে দেয়। আর কোন প্রমাণও ছিলো না।

কথা শেষ না হতে হাউমাউ করে ঘরে ঢুকলো হৃদয় নস্কর। সেজো বাবু চেঁচিয়ে উঠলো। এ হনুমানটা কোথ্‌কার? এই পাহারা। বের করে দাও।

বজরা শিক ধরে দাঁড়িয়েছিল। চেঁচিয়ে বললো, খবরদার। আমার বড় ভাই হয়। গায়ে হাত দেবেন না।

সেঝোবাবু হাসলো। এ হনুমানটা তোর সহোদর? কি বলে তো বোঝা যায় না। বোস্—বলে ধমকে উঠলো সেঝোবাবু। বোস্—

বজরা দেখলো, বড়ভাই চেয়ারে ঠিক বসতে পারছে না। ল্যাংচানো ঢং-এ গিয়ে চেয়ারের ডানাতে বসলো। বেঁটে খাটো শক্ত চেহারায় হৃদয়ের গলা খাটো। চাপ দাড়ি লাগানো মুণ্ডুটা সেই ধড়ে আলগা করে বসানো। খোলা বুকে কালো মোটা পাকের লোম। সান্নিপাতিকের রুগী বাবু। ওরে মারবেন না—

দূর বোকা! আমরা মারি নাকি? এ তো বড় হাবা।

হৃদয় বেশি কথা বলতে পারলো না। চেঁচিয়ে বললো, ও ভগবানদা। বাইরে কেন? ভিতরে আসো।

ভগবান মোড়লের থানা পুলিশ কোনদিন সহ্য হয় না। সে দু'হাতে কী থালি উৎসর্গের ধাচে ধরে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকলো। তখন হৃদয় নস্কর বলে যাচ্ছিল—ভাইডিরে আমরা সৎ করে নেব। আপনি যদি সহায় হন বাবু।

সেঝোবাবু বুঝলো—কে কোন বাবু—এ উজবুক তার কিছুই জানে না। অথচ চন্দনেশ্বর ফাঁড়ি তো এ মহকুমার থানার আণ্ডারে।

কি ভাবে সৎ করবি! তোমার গুণধর ভাইয়ের মাথায় তো বারখানা ডাকাতি মামলার মুকুট।

যা খরচাপাতি লাগে আমরা তিনখান গাঁ মিলে প্যালা দে তুলে দেবো বাবু। আপনার পায়ে পড়ি।

সেঝোবাবু তার পাশের টেবিলের আরেক বাবুর দিকে তাকিয়ে হাসলো! তারপর তো আবার দিনের বেলার হাতের কাজ—কুশবেড়ে? বলেই হো হো করে হাসলো সেঝোবাবু।

হৃদয় নস্কর চেঁচিয়ে উঠলো। না। না বাবু। কুশবেড়ে ও যায়নি।

না যাক্। মাথার বুদ্ধি তো তোমার সহোদরের—

একদম না বাবু।

আমরা সদরে চালান দিয়ে দেব। ওসব কথা সেখানে গিয়ে বলিস।

বজরার দিকে একবার তাকিয়ে হৃদয় আবার হাউমাউ করে উঠলো। সান্নিপাতিকের রুগী বাবু! তাহলি একদম মারা যাবে—

সেখান থেকে খালাস করে আনবি। খরচাপাতির বন্দোবস্ত তো করে ফেলেছিস—

ঠিক এই সময় তিনখানা গাঁয়ের প্যালা খুচরো নোটে মিলিয়ে প্রায় চারশো টাকা—ভগবান মোড়ল কাঁপা কাঁপা হাতে সেঝোবাবুর টেবিলে শব্দ করে রাখলো। আমাদের তিনখানা গাঁয়ের বল ভরসা। বজরারে সৎ করে দ্যান্। আমরা ভাগের জমি জোটায়ে দেব ওরে—। যারে যা ভিজোতি খরচা পড়ে—তা করেন বাবু—

শেষের কথাটায় কি ছিল। আলোজ্বালানো সন্ধ্যের অফিস। টেবিলে টেবিলে বাবু। দেওয়ালে ওয়ালক্লকে টিকটিক। বারান্দায় বেঞ্চে পাহারা। গেটে রাইফেল কাঁধে সেপাই। টুলে হাবিলদার। দেওয়ালের আঙটায় হাত-কড়ার মালা। গুপ্ত গোপন অন্দরের ব্যাপার একদম খোলাখুলি সদরে? সেঝোবাবু উঠে দাঁড়িয়ে এক চড় কষালো ভগবানকে। ঘুষ দেবার জায়গা পাওনি?

ভগবান ছিটকে পড়লো মেঝেতে। হৃদয় নস্কর কিছু বুঝতে না পেরে আবার হাউমাউ করে উঠলো। কোন দোষ নেবেন না বাবু। আমার সহোদরটারে সৎ বানাবো বলে—

তাই বলে আমাদের অসৎ বানাবি? সেঝোবাবু শব্দ করে চেয়ার সরিয়ে এগিয়ে এলো। এসেই আরেক চড়ে হৃদয়কে মেঝেতে ফেলে দিল।

আর অমনি বজরা তার শরীরটা গরাদে চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলো। মারবেন না সাইঝেবাবু। ল্যাংড়া মানুষ—মারবেন না। খবরদার। বোকাসোকা—

চুপ—বলে চেঁচিয়ে ধমকালো সেঝোবাবু। তারপর মেঝে থেকে দু'টিকে তুলে ধরে আরেক ধমক। ঝটপট টাকাকড়ি তুলে নে বিদেয় হও। জানো তোমাদের চালান দিয়ে দিতে পারি—

একথায় ভগবান বুড়ো কুকুরের চেয়েও শীত লাগা গলায় টানা চেঁচানী জুড়ে দিলো। মরে যাবো বাবু।

হৃদয় নস্কর কাপড়ের খুটে চোখ মুছতে মুছতে সেই খুটেই নোট আর খুচরো বেঁধে নিল। বাইরের পাহারা যখন দু'জনকে ঘাড় ধরে বের করে দিচ্ছিল—তখন ওর ভেতর হৃদয় গরাদে তাকালো। কোন কথা বলার ফুরসৎ নেই। সে গরাদে তখন বজ্রেশ্বর লেপ্টে ছিল। তার পেছনে হাজতের বাকি জায়গাটা তখন অন্ধকার। চোখের সামনে দিয়ে বড়ভাই আর ভগবানদা চলে গেলেও বজরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল—সাইঝেবাবুর টেবিল থেকে বাটা হলুদের কায়দায় হৃদয় নস্কর টাকা পয়সা কাচিয়ে কাচিয়ে খুটে ফেলছে। তার নামে তোলা—তিনখানা গাঁয়ের প্যালা।

অফিসঘরে পরিষ্কার ইলেকট্রিক বাতি। আবার চা। বিড়ি সিগারেট। হাসিঠাট্টা। কালি শিকদারকে আগে থেকেই চেনে বজরা। তিনি একজন পকেটমার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই এক কাপ চা হাতে নিয়ে শিকদারবাবু ফুঁ দিয়ে খেতে লাগলেন। বড্ড গরম যে—

তারপর পকেটমারকে বললেন, ডানহাতখানা তোল্।

ছোকরাকে চেনা চেনা লাগলো বজরার। সদর হাজতে দেখা হয়েছিল। ঠিক মনে করতে পারলো না। পকেটমার হাত তুলতেই শিকদারবাবু বাঁ হাতে একখানা রুল নিয়ে ছোকরার কনুইতে তাগ করে একটা খটাং। যন্ত্রনায় ছোকরা পড়ে গেল মেঝেতে।

নে নে। ওঠ। চা শেষ হয়নি এখনো আমার।

এমন জুৎসই মানুষ যদি পাইপগানের তাগ মত মিলে যায় তো কথাই নেই। ভাবতে ভাবতে বক্রেশ্বর আর গরাদ থেকে সরতেই পারেনি। তার পেছনের হাজতঘরের কোণের অন্ধকার এবার জেগে উঠলো।

ঘড়ঘড় গলায় সে অন্ধকার থেকে-সন্ধ্যেবেলার প্রথম কথা—বক্রেশ্বর। বক্রেশ্বর এসে গ্যালাম মশাইরা—

চমকে ফিরে তাকালো বজরা। আরে। শী মশায়ের পো। এ কি অবস্থা? বজরা কোন কথাই বলতে পারলো না। জানতো—জগা এখানে। কিন্তু তাই বলে?

একমাথা চুল। মুখভর্তি দাড়ি। লাল চোখ নিয়ে বজরার সামনে এসে আবার সেই চেঁচানী।

বক্রেশ্বর। এসে গ্যালাম। এবার নেমে চ্যান করে নিন সবাই—

জগা কথা বলছিল—আর যেন কোন বাস থামিয়ে প্যাসেঞ্জার নামছিল। যে প্যাসেঞ্জার দেখা যায়না। বাসও দেখা যায় না। বজরার চেয়ে ছোটই হবে। এই বাবুটিকে সে চন্দনেশ্বরের সদর রাস্তায় রেলবাজারের গায়ে সারাদিন বসে মিস্ত্রী নিয়ে বাস সারাতে দেখেছে। ভদ্দরলোকের এরকম অবস্থা হয়! নাড়ুর পো'র তো বিশ পঞ্চাশ দশা। বদ্ধ পাগল। এর সঙ্গে এক হাজতে? এখনও সারাটা রাত্তির সামনে।

যে বাস দেখা যায় না—সেই বাসটা চালিয়ে যেখানে থামালো জগা—তার নাম কীর্ণাহার। সেই কীর্ণাহার—কীর্ণাহার বলে চেঁচাতে লাগলো জগন্নাথ। আর সেই সঙ্গে তুড়িলাফ। নামুন। নামুন। এবার ভোজন। ভাত বোসবে মশাইরা—

কালি শিকদার চেঁচিয়ে উঠলো, ও সেঝবাবু। এ জিনিস কবে চালান হবে? আর তো বাসের জ্বালায় পারা যায় না।

বোলপুরের কাগজপত্তর আসুক। তবে তো সদরে যাবে—

বজরা একা এই পাগলের সামনে আবছা আলোয় হাসলো। জিনিস সদরে চালান হয় কি করে এত তাড়াতাড়ি! নাছুরে টিপে পয়সা ওথলাতে সময় চাই যে—

চালান করে দিন তো আলিপুরি। একটা রাত্তিরও ঘুমোতে দেয় না। বলতে বলতে কালি শিকদার গরাদ খুলে ভেতরে এলো। বজরা দেওয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়ানো। সান্নিপাতিক জ্বরের পর এমনিতেই তার মাথা ঘোরে। তারপর যদি শিকদারবাবু চড়ান তো আর দেখতি হবে না। বজরা যতটা পারে দেওয়ালে লেপ্টে গেল।

পাম্পসু উথলে পায়ের পাতায় টোবা টোবা মাংস। জুতোর বাইরে গোড়ালির গাঁট সবচেয়ে বড় সুপুরির চেয়েও বড়। তার ওপর থেকে ধুতিটা রীতিমত মিহিন। শিকদারবাবু এগিয়ে এসে এক রদ্দায় জগাকে এমন করেই কোণে ছিটকে দিল—যাতে বজরার মুখ দিয়ে আপনা আপনিই বেরিয়ে এলো, করেন কি? করেন কি? ভদ্দরলোকের ব্যাটা—আদরে মানুষ।

কালি শিকদার চোখ তুলে তাকালো। এসে গেছিস। বাঃ। তা খুব যে মায়া।—বলে এগিয়েও এলো। তারপর কি ভেবে পিছিয়ে গেল। গরাদ খুলে বাইরে বেরিয়ে খুব মন দিয়ে তালা দিল। তারপর সোজা বজরার দিকে তাকিয়ে বললে, আজ রাত্তিরে তোর হবেনে—

রাস্তা দিয়ে বাস যায়। তার শব্দ বোঝা যায় হাজতের মেঝেতে বসে। শেষ বাসটাও চলে গেল। তারও অনেক পরে কালি শিকদার এলো। গরাদ খুলে ভেতরে। পেছনে সাইঝেবাবু। আর একজন পাহারা। তখন অফিস ঘরের আলো নেভানো সারা। শুধু বারান্দার আলোয় বজরা দেখতে পাচ্ছিল, থানার দেওয়ালের বাইরেই একটা বেশ পুরনো বটগাছ ঝুরি ঝুলিয়ে

দাঁড়িয়ে আছে। সদর আলিপুরেও এমন আছে। যেমন সব থানার সামনেই থাকে।

জগা আবার আঁধার হয়ে ঘুমোচ্ছিল। বাইরের দক্ষিণা বাতাস এখানেও একটু একটু। বজরা বসেই ঝিমোচ্ছিল। তাকে আর উঠে দাঁড়াতে বলতে হল না। নিজেই পটাং করে দাঁড়ালো। এর আগে কয়েকবার সে এমন ডাকাতির পরেপর ধরা পড়ে কচুয়া ধোলাই হয়েছে। জামিনে খালাশ হওয়ার আগে অব্দি রা কাড়েনি। নৌকো হয়ে মার খেয়েছে। মার ঠেকিয়েছে। শুধু পয়লা চোটটা সামলে নেবার নিয়ম।

কুশবেড়েয় কাকে পাঠালি?

বজরা কাউকে পাঠায়নি। তবে জানে—কার কাজ। বিলে মিস্ত্রী ছাড়া কেউ না। সঙ্গে নিশ্চিত ওর বড় ভাই পালানও আছে। কিন্তু সে তো নাম বলতে পারে না। হোক না পালান রাজসাক্ষী। বজরা নিজি কি করে বিশ্বাস ভাঙে? নৌকো করে শিকদার বাবুর পয়লা লাথিটা সামলালো। কিন্তু দোবারা আর পারলো না। কোৎ করে শব্দ উঠলো মুখে। মেঝেতে পড়ে গেল বজরা।

তখন তখনই চুলের মুঠি ধরে তাকে দাঁড় করানো হল। বজরার ঘুম পাচ্ছিল। তার ভেতরেই জগার গলা চৌহুনে। মরা পুঁটিগুলো। টপাটপ লাফ দিয়ে পুকুরে পড়ছে গো। কচুপাতা দিয়ে ঢাকো নি?

বজরার মন বলছিল, গলাটা বড় মিষ্টি তো। টেরও পাচ্ছিল—মরা পুঁটি লাফিয়ে তারই মাথায় পড়ছে। বড় সত্যি কথা বলে জগন্নাথ। যা বলে তাই ঘটে যায়। একটা মাছ তার মাথা থেকে গড়িয়ে বুকে পড়লো। ভীষণ ঠাণ্ডা।

কাকে কাকে পাঠালি কুশবেড়ে?

কুশবেড়ের খবর আমি জানিনে বাবু। মারতি হয় মারেন—। কথা কেন আর?

তেসরা লাথি তাকে একদম দেওয়ালে ছিটকে দিল। সে অবস্থাতেও বুঝলো, জগা তখনো কচুপাতা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে মরা পুঁটি ঢাকা দিচ্ছে। মেঝের উপর। শিকদারবাবু—সাইঝে-বাবু—পাহারার ছায়া আর জোড়া জোড়া পায়ের ভেতর দিয়ে গলে গিয়ে গিয়ে। হাজতের খাবারে জগন্নাথের শরীরে তো আর কিছু নেই। তার নিজের শরীরটাও সান্নিপাতিক জ্বরের পর কিছু নরম। নয়তো এত তাড়াতাড়ি ঘুম পায়! অন্য অন্যবার সে ঘণ্টা খানেক ধরেও ধোলাই হজম করে জেগে থাকতো। সে হল গিয়ে বক্রেশ্বর নস্কর। জংশন চন্দনেশ্বরের রেলবাজার—আর তার চৌ-চৌহদ্দির সবাই তাকে ডরায়। ভাগ্যিস সে-সব লোকজন কেউ এখানে সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। নইলে কী কেলেঙ্কারিটাই হোত। রেলবাজারে সে আর কোনদিন মুখ তুলে তাকাতে পারতো না।

শিকদারবাবুর হাতে বেশ জোর। তাকে আবার চুলের ঝুটি ধরে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তবু দাঁড়ানো কি যায়! এ বিটকেল মুখটা যাবে কবে? এর ভেতরে জগা আবার মরা পুঁটি ঢাকা দিচ্ছিল। বজরার হাসিও পাচ্ছিল। যে মাছ দেখা যায় না সে মাছও ধরে! তাও আবার ঢাকা দিতে হয়? যে কচুপাতা দেখা যায় না—তাই দিয়ে! ভালো নকশা দেখালে জগাবাবু।

বজরা একটা খিচুনী টের গেল নিজির পেটের ভেতর! যে খিচুনী থামতেই চায় না। একদম অটোমেটিক। সদর মহকুমার অটোরিক্সো।

কালি শিকদার এবার দিল রদ্দা। বাঁ হাতের চেটো খাঁড়ার ধাঁচে কাৎ করে। ডান দিক থেকে বাঁয়ে। বজরার বাঁ কানচলে। বড়মাছের লেজের ঘাই। দেখার আগেই মিলিয়ে যায়।

ভুগ্ ভুগ্ করে রক্ত বেরিয়ে এলো বজরার ঠোঁট দিয়ে।

সাইঝেবাবু এগিয়ে এসে বললো, এই বেলা বলে ফ্যাল্ বজরা।

আর কত থাপাবে? একটু রেস্ট দরকার না শিকদারের? বুঝদার হ। তুই হলিগে আমাদের চেনা পরিচিত্ লোক।

পড়ে যেতে যেতে বজরা বললো, দিলেন তো কানটা বন্ধ করে। এখন যা বলবেন তার কিছুই শুনতি পাবো না। অমনি মেজাজ খারাপ করবেন। আর ধপাধপ থাপাবেন। লাভ হবে কিছু?

শেষের কথাগুলো জড়িয়ে গেল বজরার। এত আগে তো সে কোনদিন জ্ঞান হারায় না? কি লজ্জা! কি লজ্জা!! ও বড়ো খুড়ো। ও মাইঝে খুড়ো—

পাহারা আর শিকদার মিলে তাকে ঘুমিয়ে পড়তে দিল না। এরই ভেতর জগন্নাথ খুব কাছাকাছি মরা পুঁটি ঢাকা দিতে গিয়ে আরেকটা লাথি খেল। সঙ্গে সঙ্গে আঁধার করে হাজতঘরের সেই কোণে ছিটকে গিয়ে পড়লো। তখন তখনই আর উঠলো না।

বজরার কানের ঝুলফি উল্টো মুখে ডলে দিতেই সে চোখ চাইলো। হাঁ। আমার বড়ভাইরে মারলেন কেন সাইঝেবাবু?

আদর করবে! এবার বল বাবা! কারে কারে কুশবেড়ে পাঠালি?

যে ডাকাতিতে নেই আমি—তার কথা বলি কি করে বলেন তো?

তার ঝোলা চোখে তাকিয়ে শিকদার বুঝলো, এই তো সময়। তখন তখনই জানতে চাইলো, কোন্ ডাকাতিতে ছিলি? কুশবেড়েয় তো তোর ধাঁচে মই ব্যাভার। খোড়ো চালে আগুন ধরানো। একেবারে তাড়দার ডাকাতির ধারায়—

জ্ঞান হারাতে বজরা বললো, তাড়দায় মই বাইয়ে উঠে আগে ঘরের চালের খড়ের ময়ুরে আগুন ধরাই। তারপর তো পাইপগান—

তারপর কি করলি তাড়দায়? বলতে বলতে শিকদার আবার

বজরার ছুই ঝুলফি উল্টোমুখে ডলে দিল। পাহারা পেছন থেকে ছুই বগলে হাত ভরে বজরাকে ভালো করে দাঁড় করালো।

অমনি বজরা বড় বড় ঝোলা চোখে তাকালো। সে দৃষ্টি শূন্য। গুলি চালাচ্ছিল গেরস্থ। কি করি? নল ঘুরোয়ে দেলাম—সাইঝেবাবু তো সব বোঝেন—

সাইঝেবাবু তখন গাঢ় গলায় বললো, এখন রাখো শিকদার। আর হবে না।

দিনির বেলায় সময় পাবেন?

নাঃ। সদরে সাক্ষী আছে। তাড়দার কথাটাও সরকারী উকিলকে জানানো দরকার। উঃ, কী ভোগান্তির মামলারে—। এক তাড়দাই শেষ করবেনে আমাদের। তারপর আবার কুশবেড়ে।

বজরাকে ফেলে দিয়ে ওরা তিনজন হাজতের বাইরে চলে আসার পর খানিকক্ষণ থানা একদম শান্তশিষ্ট। মাছিও ওড়ে না। কিন্তু মশা ভীষণ। তাদের কামড় বোঝার উপায়ও ছিল না বজরার। বেহুঁস!

শেষরাতে জগা তাকে জাগালো। তার গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে। ব্যথা জায়গার ওপর গুঁজন দিয়ে। গায়ের ছুর্গন্ধ দিয়ে। জেগে গিয়েই প্রথমে ইচ্ছে হল বজরার—বড় খুড়োয় বসে মেজো খুড়োর ঠাণ্ডা গায়ে মাথা—গাল পেতে দেয়। ও মাইজে খুড়োরে। মার খেলি এখনো বড় ব্যথা লাগে। পাথরের কোন মলম নাই?

সে ভাবনা তার কেটে দিল জগা। কেননা জগা বলে যাচ্ছিল, এরা বড় দেরিতে দেরিতে মারে। মারার বলেই শুধরে নিলো। একদম মরবার জন্যি চাই হাম্বর।

জগা বাবু পাগল হলি কি হয়! কথাগুলো বড় মজার মজার বলেন। হাজত ঘরের আঁধার ছড়ানো ইলেকট্রিক বাতির খোপে অনেক ময়লা বলে যতখানি আলো—ততখানিই আঁধার। চোখ

জোড়া ভার—অথচ শেষ রাত্তিরের বাতাস এসে ছুঁয়ে দিতেই সেই চোখেই আরাম পেল বজরা। তাই হেসে ফিস ফিস করে বললো, মরা পুঁটিগুলো কোথায় জগাবাবু?

ওরা তো পুকুরে ঝাঁপ দিল। টপাটপ। কচুপাতা ঢাকা দেয়নি যে—। যে হাম্বর দিয়ে টায়ার খোলে—

বজরা বুঝলো, ভবি ভোলার না। ঘুরে ফিরে সেই হাম্বর।

জগা তখন বলছিলো, একদম শিরদাঁড়ায় কসানো চাই। একটুও ফাঁক না দিয়ে—

বজরা নড়ে চড়ে বসলো। এখন তো আর শিকদার আসবে না। ও জগাবাবু। বেশ ফিস ফিস করেই বললো। কে জানে—অন্ধকার অফিস ঘরে যদি পাখা চালিয়ে শিকদার শুয়ে থাকে। যদি তার গলা পেয়ে উঠে আসে? ওই তো পাখা ঘোরার শব্দ।

জগা ফিরে তাকাতেই বজরা বললো, শশী কোথায় গো জগাবাবু?

একদম নিকেশ। শিরদাঁড়ায় তাগ করে তিনবার ঝাড়লাম হাম্বর—

চুপ। শুনতি পাবে।

শুনুক না।

বজরার সন্দেহ হল। এ সত্যি-সত্যি পাগল তো। শেষে জামিন পাবে না জগাবাবু।

বজরার কথা উড়িয়ে দিল জগন্নাথ। সত্যি কথা কবে মার খায়?

বজ্রেশ্বরের সব গুলিয়ে গেল। থানার বাইরের আলো দেওয়ালের ওপারের বটতলায় আকাশের আলোর মিশেলে পরেপ্পর ফিকে—আরও ফিকে হয়ে যাচ্ছিল। নাহুর পো পাগল? না সাধু? একেবারে আত্মজ্ঞানী! বজরা গুম খেয়ে চুপ করে গেল।

বড় রাস্তায় চায়ের দোকানের ছোঁড়া ভেতরে বড় খুরি গলিয়ে দিয়ে ঠকাঠক শব্দে বজরার ঘুম ভাঙলো। তখন বারান্দায় রোদ্দুর। হাজত ঘরের সেই কোণে জগাবাবুর নাক ডাকছিল। বজরা বুঝলো, ভদ্দরলোকের ছেলেটার এবার বুকেরও দোষ হবে। এত ঠাণ্ডা মেঝে। আর দোষ হলিই বা! যদি এ ফাঁড়া কাটিয়ে দিয়ে বাঁচে—তবে তো দোষ!

বারান্দায় রোদ্দুরের ফালিতে সনেকা দাঁড়ানো। এক হাতে ভিজে ভিজে আঁটি-ছুচ্চার থানকুনি। অন্যহাতে বজরার চেনা থল। সারাটা জ্বরের বেলা ওই থলে নানান পাতার রস হয়। সারা ফেমিলির জন্যি। সেই সে বাপের আমল থে।

সনকা নস্করের পাশেই আরেকজন। দেখেই চিনলো বজরা। গায়ে চেক শার্ট। বজরার মনটা নেচে উঠলো। বিলে বলে ডেকে উঠেছিল আর কি। হাতে জিলিপির ঠোঙা। কোনদিন তো ধরা পড়েনি বিলে—তাই তার চেহারাই চেনে না থানা।

মনে মনে বললো, বড় খুড়োরে—। মাইঝে খুড়োরে—। দেখে যাও। মানুষের তলানীতে এট্টু টান ভালবাসা পড়ে থাকে। সকালটাই তার অন্যরকম লাগলো। গায়ের পাথর ব্যথা—মাথা, কান, মুখের পাথর ভার এখন যেন আরামের কোন নতুন চাপ। যে টাটানিতে ভালো লাগে আর কি।

দাঁতন করতে করতে শিকদারবাবু থানায় ঢুকছিল। সনকা নস্কর আর বিলে মিস্ত্রী সম্ভ্রম ভরে হাতের জিনিস দেখিয়ে চোখ দিয়ে হাজত ঘর দেখালো। তার মানে—যদি অনুমতি করেন তো দে আসি—

শুটকি মত সিড়িঙ্গে মেয়েছেলে সকালবেলা ঘুমভাঙা চোখে কার ভালো লাগে? তারপর চেকশার্টের হাতে জিলিপির ঠোঙা। কালি শিকদার না বলে দিচ্ছিল। কিন্তু বজরার গলায় চমকে গেল।

বজরা বলছিল, ওদের আসতি ছ্যান্ শিকদারবাবু। তার আগে খাতাখানা আনান।

জেগেছিস? এত তাড়াতাড়ি? খাতা?

মশায় ঘুমোনো যায়? খাতা কোথায়? লিখে নেবেন না—?

তখনো কালি শিকদার বুঝতে পারেনি। তার দাঁতন বন্ধ।

বজ্রেশ্বর নস্কর বললো, খাতায় তাড়দার আগুনের কথাটা লিখে ছ্যান্না কেন। সই তো পারিনে। টিপছাপ দিতি পারি।

কালি শিকদার আসামীর এসব বিলাকি ঝিলকি বিশ্বাস করে না। অবহেলা ভরে সেঝোবাবুর টেবিলের ওপর খাতার পাহাড় হটকাচ্ছিলো।

বজ্রেশ্বর বেশ ধমকেই বললো, লেখাপড়ার ব্যাপার। সাইঝে বাবুরে ডাকেন না কেন একবার। এই তো আমার ধর্মপত্নী—সনেকা নস্কর। ঈশাদি সাক্ষীর টিপছাপ সনেকা দেবেনে।

বজরার মুখে নিজের নাম শুনে সনকা গরাদের কাছে চলে এলো। সকালের রোদ্দুরের ঠিকরানো আভায় স্বামীর মুখখানা খুব ভার ভার ঠেকছে। চোখ ফোলা।

শেষ